প্রকাশ করলেন, তখন কোন কোন অপক্ক নওমুসলিম এ কথাকে মিথ্যা মনে করে মুরতাদ হয়ে গেল।---(কুরতুবী)

এ ঘটনা থেকে একথাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, رؤيا শব্দটি আরবী ভাষায় যদিও স্বপ্নের অর্থেও আসে, কিন্তু এখানে স্বপ্নের কিস্‌সা বোঝানো হয়নি। কারণ, এরূপ হলে কিছু লোকের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কোন কারণ ছিল না। স্বপ্ন তো প্রত্যেকেই দেখতে পারে। বরং এখানে رؤيا শব্দ দ্বারা জাগ্রত অবস্থায় অভিনব ঘটনা দেখানো বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তফসীরে কোন কোন তফসীরবিদ মি'রাজের ঘটনা ছাড়া অন্যান্য ঘটনা বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু সেগুলো এখানে খাপ খায় না। একারণেই অধিক সংখ্যক তফসীরবিদ মি'রাজের ঘটনাকেই আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন। ---(কুরতুবী)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ قَالَ ءَأَسْجُدُ
لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ
إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾ قَالَ اذْهَبْ فَمَن
تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿٦٣﴾ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ
اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ
فِي الْأَمْوَٰلِ وَالْأَوْلَٰدِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾ إِنَّ
عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾

(৬১) স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ আদমকে সিজদা কর তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদায় পড়ে গেল। কিন্তু সে বলল ঃ আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করব, যাকে আপনি মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? (৬২) সে বলল ঃ দেখেন তো, এ না সে ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার চাইতেও উচ্চমর্যাদা দিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সময় দেন, তবে আমি সামান্যসংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট করে দেব। (৬৩) আল্লাহ্ বলেন ঃ চলে যা, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যে তোর অনুগামী হবে, জাহান্নামই হবে তাদের সবার শাস্তি--- ভরপুর শাস্তি। (৬৪) তুই সত্যচ্যুত করে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়াজ দ্বারা, স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর, তাদের অর্থসম্পদ ও

সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। ছলনা ছাড়া শয়তান তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না। (৬৫) আমার বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই। আপনার পালনকর্তা যথেষ্ট কার্যনির্বাহী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (সে সময়টি স্মরণযোগ্য) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ আদমকে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করল; কিন্তু ইবলিস (করেনি এবং) বলল ঃ আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করব, যাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? (এ কারণে সে বিতাড়িত হয়ে গেল। তখন) বলতে লাগল ঃ এ ব্যক্তিকে যে আপনি আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন (এবং এ কারণেই তাকে সিজদা করার আদেশ দিয়েছেন), আচ্ছা বলুন তো (এর মধ্যে কি শ্রেষ্ঠত্ব আছে, যে কারণে আমি বিতাড়িত হয়েছি?) যদি আপনি (আমার প্রার্থনা অনুযায়ী) আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত (মৃত্যু থেকে) সময় দেন তবে আমি (ও) অল্প কয়েকজন ছাড়া (যারা খাঁটি হবে, অবশিষ্ট) তার সব সন্তানকে নিজের বশীভূত করে নেব (অর্থাৎ গোমরাহ্ করে দেব) আল্লাহ্ বললেন ঃ যা (তুই যা করতে পারিস, করে নে), তাদের মধ্যে যে তোর সঙ্গী হবে, তাদের সবার শাস্তি জাহান্নাম— ভরপুর শাস্তি। তাদের মধ্য থেকে যার উপর তোর আধিপত্য চলে স্বীয় আওয়াজ দ্বারা (অর্থাৎ কুমন্ত্রণা ও অপহরণ দ্বারা) তার পা (সৎ পথ থেকে) উপড়িয়ে দে এবং তাদের উপর স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে যা (অর্থাৎ তোর গোটা বাহিনী সম্মিলিতভাবে পথভ্রষ্ট করার কাজে শক্তি নিয়োজিত করুক) এবং তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানাদিতে নিজের অংশ স্থাপন করে নে (অর্থাৎ ধনসম্পদ ও সন্তানাদিতে পথভ্রষ্টতার উপায় করে নে; যেমন তাই হতে দেখা যায়) এবং তাদের সাথে (মিছামিছি) ওয়াদা করে নে (যে, কিয়ামতে গোনাহ্‌র হিসাব হবে না। হুমকি-হুঁশিয়ারির ছলে শয়তানকে এসব কথা বলা হয়েছে।) শয়তান তাদের সাথে সম্পূর্ণ মিথ্যা ওয়াদা করে। (এ কথাটি মধ্যবর্তী বাক্য হিসাবে বলা হয়েছে।) অতঃপর আবার শয়তানকে বলা হচ্ছে ঃ) আমার খাটি বান্দাদের উপর তোর ক্ষমতা চলবে না। (হে মুহাম্মদ, খাঁটি বান্দাদের উপর তার ক্ষমতা কিভাবে চলতে পারে) আপনার পালনকর্তা (তাদের) যথেষ্ট কার্যনির্বাহী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَأَحْتَنِكَنَّ — احتناك শব্দের অর্থ কোন বস্তুর মূলোৎপাটন করা, ধ্বংস করা অথবা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা। وَاسْتَفْزِزْ — استفزاز শব্দের আসল অর্থ বিচ্ছিন্ন

করা। এখানে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা বোঝানো হয়েছে। صوتك بصوتك শব্দের অর্থ আওয়াজ। শয়তানের আওয়াজ কি? এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ গান, বাদ্যযন্ত্র ও রং তামাশার আওয়াজই শয়তানের আওয়াজ। এর মাধ্যমে সে মানুষকে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ থেকে জানা গেল যে, বাদ্যযন্ত্র ও গান-বাজনা হারাম। —(কুরতুবী)

ইবলীস হযরত আদমকে সিজদা না করার সময় দু'টি কথা বলেছিল। এক. আদম মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে এবং আমি অগ্নি দ্বারা সৃজিত। আপনি মাটিকে অগ্নির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন কেন? এ প্রশ্নটি আল্লাহ্‌র আদেশের বিপরীতে, নির্দেশের রহস্য জানার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কোন আদিষ্ট ব্যক্তির এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট ব্যক্তির যে রহস্য অনুসন্ধানের অধিকার নেই, এ কথা বলাই বাহুল্য। কারণ, দুনিয়াতে স্বয়ং মানুষ তার চাকরকে এ অধিকার দেয় না যে, সে তার চাকরকে কোন কাজ করতে বলবে এবং চাকর সেই কাজটি করার পরিবর্তে প্রভুকে প্রশ্ন করবে যে, এর রহস্য কি? তাই ইবলীসের এই প্রশ্নটিকে উত্তরের অযোগ্য সাব্যস্ত করে আয়াতে তার উত্তর দেওয়া হয়নি। এছাড়া বাহ্যিক উত্তর এটাই যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অধিকার একমাত্র সে সত্তার, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি যখন যে বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন, তখন তাই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে।

ইবলীসের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, যদি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত জীবন দান করা হয়, তবে আমি আদমের গোটা বংশধরকে অবশ্য তাদের কয়েকজন ছাড়া পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এর উত্তরে বলেছেন ঃ আমার খাঁটি বান্দা যারা, তাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা চলবে না; যদিও তোর গোটা বাহিনী ও সর্বশক্তি এ কাজে নিয়োজিত হয়। অবশিষ্ট অখাঁটি বান্দারা তোর বশীভূত হয়ে গেলে তাদেরও দুর্দশা তাই হবে, যা তোর জন্য নির্ধারিত, অর্থাৎ জাহান্নামের আযাবে তোদের সবাই গ্রেফতার হবে। আয়াতের أجلب عليهم بخيلك ورجلك বাক্যে শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে করে বাস্তবেও শয়তানের কিছু অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক বাহিনী জরুরী বিবেচিত হয় না; বরং এই বাকপদ্ধতিটি পূর্ণ বাহিনী তথা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তবে যদি এরূপ থেকেও থাকে, তবে তাও অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ যারা কুফরের সমর্থনে যুদ্ধ করতে যায়, সেসব অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী শয়তানেরই অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী। এখন প্রশ্ন রইল, শয়তান কিরূপে জানতে পারল যে, সে আদমের বংশধরগণকে কুমন্ত্রণা দিয়ে পথভ্রান্ত করতে সক্ষম হবে? সম্ভবত সে মানুষের গঠনপ্রকৃতি দেখে বুঝে নিয়েছে যে, এর মধ্যে কুপ্রবৃত্তির প্রাবল্য হবে। তাই কুমন্ত্রণার ফাঁদে পড়ে যাওয়া কঠিন হবে না। এছাড়া এটা যে মিছামিছি দাবীই ছিল, তাও অবান্তর নয়।

وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ - মানুষের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরীকানার অর্থ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে এই যে, ধনসম্পদকে অবৈধ হারাম পন্থায় উপার্জন করা অথবা হারাম কাজে ব্যয় করাই হচ্ছে ধনসম্পদে শয়তানের শরীকানা। সন্তান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরীকানা কয়েক-ভাবে হতে পারেঃ সন্তান অবৈধ ও জারজ হলে, সন্তানের মুশরিকসুলভ নাম রাখা হলে তাদের লালন-পালনে অবৈধ পন্থায় উপার্জন করলে।---(কুরতুবী)

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا
إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنتُمْ
أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا
لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ
عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا
بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

(৬৬) তোমাদের পালনকর্তা তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান চালনা করেন, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পারো। নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (৬৭) যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আসে, তখন শুধু আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহবান করে থাক তাদেরকে তোমরা বিস্মৃত হয়ে যাও। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে স্থলে ভিড়িয়ে উদ্ধার করে নেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (৬৮) তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছে যে, তিনি তোমাদিগকে স্থলভাগে কোথাও ভূগর্ভস্থ করবেন না। অথবা তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করবেন না, তখন তোমরা নিজেদের জন্য কোন কর্মবিধায়ক পাবে না। (৬৯) অথবা তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, তিনি তোমাদেরকে আরেকবার

সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না, অতঃপর তোমাদের জন্য মহা ঝটিকা প্রেরণ করবেন না, অতঃপর অকৃতজ্ঞতার শাস্তিস্বরূপ তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন না, তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে সাহায্যকারী কাউকে পাবে না। (৭০) নিশ্চয় আমি আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদের স্বপক্ষে এবং অংশীবাদের বাতিল প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ বিষয়ের উপরই এক বিশেষ ভঙ্গিতে আলোকপাত করা হয়েছে। এ আলোচনার সার হলো, আল্লাহ্ তা'আলার যে অগণন ও মহান নিয়ামতরাজি মানবসমাজকে সর্বক্ষণ পরিবেষ্টিত করে রয়েছে তা বর্ণনার মাধ্যমে এ কথা ব্যক্ত করাই উদ্দেশ্য ছিল যে, এ সকল নিয়ামতরাজি দানকারী একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ব্যতীত আর কেউই হতে পারে না। সমগ্র নিয়ামতরাজিই একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীনের। সুতরাং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক কিংবা অংশীদার করা অপরিমেয় পথভ্রষ্টতা। ইরশাদ করেছেন ঃ) তোমাদের পালনকর্তা এমন (নিয়ামত-দাতা) যে, তোমাদের (কল্যাণের) জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালনা করেন, যাতে তোমরা তার মাধ্যমে রিযিক সন্ধান করতে পার। (এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সমুদ্র-সফর ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সাধারণত যথেষ্ট পরিমাণ লাভের কারণ হয়ে থাকে।) নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। এবং সমুদ্রে যখন তোমাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয়, (যেমন সমুদ্রতরঙ্গ ও ঝড়-তুফানের কারণে নিমজ্জিত হবার আশংকা) এক আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা অন্যান্য যাদের উপাসনা করে থাকো, তারা সব উধাও হয়ে যায়; (তখন ওদের কথা তোমাদের নিজেদেরই যেমন মনে থাকে না, তেমনি ওদেরকে আহবানও কর না। যদিও বা তাদেরকে আহবান করে থাকো, তো তাদের কাছ থেকে বিন্দুমাত্র সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশাও তোমাদের মনে জাগরূক হয় না। এ হলো স্বয়ং তোমাদের নিজেদের পক্ষ থেকেই তওহীদের স্বীকৃতি এবং শিরকের মিথ্যা হওয়ার অনুমোদন। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে দিয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ (যে, এত অল্প সময়ের মধ্যেই তারা আল্লাহ্র প্রতিদান ও নিজের আহাজারি এবং কান্নাকাটির কথা ভুলে যায়। এবং তোমরা যারা স্থলে পৌঁছে নিজেদের মুখ ফিরিয়ে রাখো) তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, তোমাদের স্থলে এনেই ভূগর্ভস্থ করবেন না? (সারকথা এই যে, আল্লাহ্র কাছে স্থল ও সমুদ্রের মধ্যে কোন বিশেষ তফাত নেই। তিনি যেমন সমুদ্রে নিমজ্জিত করতে পারেন, তেমনি স্থলেও তোমাদেরকে ভূগর্ভস্থ করে ফেলতে পারেন।) অথবা (তোমরা কি নিশ্চিন্ত রয়েছ যে) তোমাদের উপর কংকর বর্ষণকারী ঝটিকা প্রেরণ করবেন না? (যেমন আদ জাতির জন্য এ রকম বায়ু ঝড় প্রেরণ করেই তোমাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল।)

তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্মবিধায়ক পাবে না। অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত রয়েছ যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে আরেকবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাবেন না এবং তোমাদের কুফরের জন্য তোমাদেরকে নিমজ্জিত করে দেবেন না? তখন এ বিষয়ে (অর্থাৎ নিমজ্জিত করার ব্যাপারে) তোমরা আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারীই পাবে না (যিনি এজন্য তোমাদের বদলা নিতে পারেন)। এবং আমি তো আদম সন্তানকে (বিশেষ গুণাবলীতে অভিষিক্ত করে) মর্যাদা দান করেছি এবং আমরা তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে (জানোয়ার ও জলযানের উপর) সওয়ার করিয়েছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং আমি তাদেরকে আমার সৃষ্ট অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব কেন? ঃ সর্বশেষ আয়াতে অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম সন্তানদের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লিখিত হয়েছে। এ ব্যাপারে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এক. এই শ্রেষ্ঠত্ব কি গুণাবলী ও কি কারণের উপর নির্ভরশীল? দুই. অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কথা বলে কি বোঝানো হয়েছে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানকে বিভিন্ন দিক দিয়ে এমন সব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যেগুলো অন্যান্য সৃষ্টজীবের মধ্যে নেই। উদাহরণত সুশ্রী চেহারা, সুষম দেহ, সুষম প্রকৃতি এবং অঙ্গসৌষ্ঠব। এগুলো মানুষকে দান করা হয়েছে---যা অন্য কোন জীবের মধ্যে নেই। এ ছাড়া বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে। এর সাহায্যে সে সমগ্র উর্ধ্ব-জগত ও অধঃজগতকে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিভিন্ন সৃষ্টবস্তুর সংমিশ্রণে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করার শক্তি দিয়েছেন, সেগুলো তার বসবাস, চলাফেরা, আহার্য ও পোশাক-পরিচ্ছদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাকশক্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার যে নৈপুণ্য মানুষ লাভ করেছে, তা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। ইঙ্গিতের মাধ্যমে মনের কথা অন্যকে বলে দেওয়া, লেখা ও চিঠির মাধ্যমে গোপন ভেদ অন্যজন পর্যন্ত পৌঁছানো---এগুলো সব মানুষেরই স্বাতন্ত্র্য। কোন কোন আলিম বলেন ঃ হাতের অঙ্গুলি দ্বারা আহার করাও মানুষেরই বিশেষ গুণ। মানুষ ব্যতীত সব জন্তু মুখে আহার্য গ্রহণ করে। বিভিন্ন জিনিসের সংমিশ্রণে খাদ্যবস্তুকে সুস্বাদু করাও মানুষেরই কাজ। অন্যান্য সব প্রাণী একক বস্তু আহার করে। কেউ কাঁচা মাংস, কেউ মাছ এবং কেউ ফল আহার করে। মানুষই কেবল সংমিশ্রিত খাদ্য প্রস্তুত করে। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা মানুষের সর্বপ্রধান শ্রেষ্ঠত্ব। এর মাধ্যমে সে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর পরিচয় এবং তাঁর পছন্দ ও অপছন্দ জেনে পছন্দের অনুগমন করে এবং অপছন্দ থেকে বিরত থাকে। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনার দিক দিয়ে সৃষ্টজীবকে এভাবে ভাগ করা যায় যে, সাধারণ জীবজন্তুর মধ্যে কামভাব ও কামনা-বাসনা আছে, কিন্তু বুদ্ধি ও চেতনা নেই। ফেরেশতাদের মধ্যেই বুদ্ধি ও চেতনা আছে, কিন্তু কামভাব

ও বাসনা নেই। একমাত্র মানুষের মধ্যেই বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা আছে এবং কামভাব ও কামনা-বাসনাও আছে। এ কারণেই সে বুদ্ধি ও চেতনার সাহায্যে কামভাব ও বাসনাকে পরাভূত করে দেয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। ফলে তার স্থান ফেরেশতার চাইতেও উর্দ্ধে উন্নীত হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন আদম-সন্তানকে অনেক সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অর্থ কি? এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই যে, সমগ্র উর্ধ্ব ও অধঃ-জগতের সৃষ্টজীব এবং সমস্ত জীবজন্তুর চাইতেও আদম-সন্তান শ্রেষ্ঠ। এমনিভাবে বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষের সমতুল্য জিন জাতির চাইতেও আদম-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব সবার কাছে স্বীকৃত। এখন শুধু ফেরেশতাদের ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, মানুষ ও ফেরেশতা-দের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এ ব্যাপারে সুচিন্তিত কথা এই যে, মানুষের মধ্যে যাঁরা সাধারণ ঈমানদার ও সৎকর্মী; যেমন আওলিয়া-দরবেশ, তাঁরা সাধারণত ফেরেশতাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিশেষ শ্রেণীর ফেরেশতা; যেমন জিবরাঈল মীকাঈল প্রমুখ, তাঁরা সাধারণ সৎকর্মী মু'মিনদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। বিশেষ শ্রেণীর মু'মিন, যেমন পয়গম্বর শ্রেণী, তাঁরা বিশেষ শ্রেণীর ফেরেশতাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। এখন রইল কাফির ও পাপিষ্ঠ মানুষের কথা। বলা বাহুল্য, এরা ফেরেশতাদের চাইতে উত্তম হওয়া তো দূরের কথা, আসল লক্ষ্য সাফল্য ও মুক্তির দিক দিয়ে জন্তু-জানোয়ারের চাইতেও অধম। এদের সম্পর্কে কোরআনের ফয়সালা এই ঃ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ — অর্থাৎ এরা চতুষ্পদ জন্তুদের ন্যায়; বরং তাদের চাইতেও পথভ্রান্ত।---(মাযহারী)

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧١﴾ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

(৭১) স্মরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের নেতাসহ আহবান করব, অতঃপর যাদেরকে ডানহাতে তাদের আমলনামা দেওয়া হবে, তারা নিজেদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম হবে না। (৭২) যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ ছিল, সে পরকালেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রান্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সে দিনটি স্মরণ করা উচিত) যেদিন আমি সব মানুষকে তাদের আমলনামাসহ (হাশরের ময়দানে) আহবান করব। (আমলনামাগুলো উড়িয়ে দেওয়া হবে, অতঃপর তা

কারও ডান হাতে এবং কারও বাম হাতে এসে পড়বে) অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে (তারা হবে ঈমানদার), এমন লোকেরাই নিজেদের আমলনামা (সন্তুষ্টচিত্তে) পাঠ করবে এবং তাদের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ঈমান ও সৎ কর্মসমূহের পুরস্কার পুরোপুরি দেওয়া হবে---বিন্দুমাত্রও কম দেওয়া হবে না ; বরং বেশি দেওয়া যেতে পারে। তারা আযাব থেকে মুক্তিও পাবে, প্রথম পর্যায়েই কিংবা গোনাহ্‌র শাস্তি ভোগ করার পর) এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে (মুক্তির পথ প্রাপ্তি থেকে) অন্ধ ছিল, সে পরকালেও (মুক্তির মনযিলে পেঁৗছা থেকে) অন্ধ থাকবে এবং (বরং সেখানে দুনিয়ার চাইতেও) অধিক পথভ্রান্ত হবে। (কেননা দুনিয়াতে পথভ্রষ্টতার প্রতিকার সম্ভবপর ছিল, সেখানে তাও হবে না। এরাই তারা, যাদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يوم ندعوا كل اناس بامامهم—এখানে امام শব্দের অর্থ গ্রন্থ ; যেমন সূরা ইয়াসীনে রয়েছে, وكل شئ احصينه فى امام مبين এখানে امام مبين অর্থ সুস্পষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থকে ইমাম বলার কারণ এই যে, ভুলভ্রান্তি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রন্থেরই আশ্রয় নেওয়া হয় ; যেমন কোন অনুসৃত ইমামের আশ্রয় নেওয়া হয়।---(কুরতুবী)

হযরত আবূ হরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে তিরমিযীর হাদীস থেকেও জানা যায় যে, আয়াতে ইমাম শব্দের অর্থ গ্রন্থ। হাদীসের ভাষা এরূপ ঃ

يوم ندعوا كل اناس بامامهم قال يدعى احدهم فيعطى كتابه بيمينه

অর্থাৎ يوم ندعوا كل اناس بامامهم ---আয়াতের তফসীরে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, এক এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে এবং তার আমলনামা তার ডানহাতে দেওয়া হবে।

এ হাদীস থেকে নির্ণীত হয়ে গেল যে, ইমাম শব্দের অর্থ গ্রন্থ এবং গ্রন্থ অর্থ, আমলনামা করা হয়েছে।

হযরত আলী (রা) ও মুজাহিদ থেকে এখানে ইমাম শব্দের অর্থ নেতাও বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম নিয়ে ডাকা হবে---এই নেতা পয়গম্বর ও তাঁদের নায়েব মাশায়েখ ও ওলামা হোক কিংবা পথভ্রষ্টতার প্রতি আহবানকারী নেতা হোক।---(কুরতুবী)

এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম দ্বারা ডাকা হবে এবং সবাইকে এক জায়গায় জমায়েত করা হবে। উদাহরণত

ইবরাহীম (আ)-এর অনুসারী দল, মূসা (আ)-র অনুসারী দল, ঈসা (আ)-র অনুসারী দল এবং মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী দল। এ প্রসঙ্গে এসব অনুসারীর প্রত্যেক নেতাদের নাম নেওয়াও সম্ভবপর।

আমলনামা ঃ কোরআন পাকের একাধিক আয়াত থেকে জানা যায় যে, শুধু কাফিরদেরকেই বামহাতে আমলনামা দেওয়া হবে ; যেমন এক আয়াতে রয়েছে إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ অন্য এক আয়াতে রয়েছে, إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ —প্রথম আয়াতে স্পষ্টভাবে ঈমান না থাকার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে পরকালে অবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও কুফরই। এ থেকে জানা গেল যে, ডানহাতে আমলনামা ঈমানদারদেরকে দেওয়া হবে ; পরহিযগার হোক কিংবা গোনাহ্গার। তারা আনন্দচিত্তে আমালনামা পাঠ করবে এবং অন্যদেরকেও পাঠ করতে দেবে। এ আনন্দ ঈমান ও চিরস্থায়ী আযাব থেকে মুক্তির হবে ; যদিও কোন কোন কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে।

কোরআন পাকে আমলনামা ডান অথবা বামহাতে অর্পণের অবস্থা বর্ণিত হয়নি, কিন্তু কোন কোন হাদীসে تطاير الكتب শব্দটি উল্লিখিত আছে ; অর্থাৎ আমলনামা উড়ে এসে হাতে পড়বে। কোন কোন হাদীসে আছে, সব আমলনামা আরশের নীচে একত্রিত হবে। অতঃপর বাতাস প্রবাহিত হবে এবং সবগুলোকে উড়িয়ে মানুষের হাতে পৌঁছে দেবে---কারও ডান হাতে এবং কারও বাম হাতে। ---(বয়ানুল কোরআন)

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا
غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ
تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ
ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ
لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾ سُنَّةَ مَن
قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾

(৭৩) তারা তো আপনাকে হটিয়ে দিতে চাচ্ছিল যে বিষয় আমি আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি তা থেকে আপনার পদস্খলন ঘটানোর জন্য তারা চূড়ান্ত চেষ্টা

করছে ; যাতে আপনি আমার প্রতি কিছু মিথ্যা সম্বন্ধযুক্ত করেন। এতে সফল হলে তারা আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিত। (৭৪) আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন। (৭৫) তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তির আস্বাদন করাতাম। এ সময় আপনি আমার মুকাবিলায় কোন সাহায্যকারী পেতেন না। (৭৬) তারা তো আপনাকে এ ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করে দিতে চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল যাতে আপনাকে এখান থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া যায়। তখন তারাও আপনার পর সেখানে অল্পকালই মাত্র টিকে থাকত। (৭৭) আপনার পূর্বে আমি যত রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল। আপনি আমার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং এ কাফিররা (শক্তিশালী কৌশলের মাধ্যমে) আপনাকে সে বিষয় থেকে পদ-স্খলন ঘটাতে চাচ্ছিল, যা আমি ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি প্রেরণ করেছি (অর্থাৎ আপনার দ্বারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীত কাজ করাবার চেষ্টায় মেতেছিল এবং) যাতে আপনি এছাড়া (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া) আমার প্রতি (কার্যক্ষেত্রে) মিথ্যা বিষয় সম্বন্ধযুক্ত করে দেন। [কেননা নবীর কাজ শরীয়তের বিরুদ্ধে হয় না। কাজেই নাউ-যুবিল্লাহ্ রসূলুল্লাহ্ (সা) যদি শরীয়তের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতেন, তবে এর অর্থ এই দাঁড়ত যে, তিনি যেন শরীয়তবিরুদ্ধ কাজটি আল্লাহ্‌র প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করছেন।] এমতা-বস্থায় তারা আপনাকে অকৃত্রিম বন্ধু বানিয়ে নিত। (তাদের এই অপচেষ্টা এত তীব্র ছিল যে) যদি আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না বানাতাম (অর্থাৎ নিষ্পাপ না করতাম) তবে আপনি তাদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে যেতেন। এরূপ হলে (অর্থাৎ তাদের প্রতি আপনার কিছুটা ঝোঁক হলে) আমি আপনাকে (নৈকট্যশীলদের উচ্চ মর্তবার কারণে) জীবনে ও মরণে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম। অতঃপর আপনি আমার মুকাবিলায় কোন সাহায্যকারীও পেতেন না। (কিন্তু যেহেতু আমি আপনাকে নিষ্পাপ ও দৃঢ়পদ করেছি, তাই তাদের প্রতি আপনার বিন্দুমাত্রও ঝোঁক হয়নি এবং আপনি শাস্তির কবল থেকে বেঁচে গেছেন।) এবং তারা (অর্থাৎ কাফিররা) এ দেশ (মক্কা অথবা মদীনা) থেকে আপনার পা-ই উপড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, যাতে আপনাকে এখান থেকে বহিষ্কার করে দেয়। এরূপ হলে আপনার পর তারাও খুব কমই (এখানে) টিকতে পারত ; যেমন পয়গম্বরদের সম্পর্কে (আমার) এই নীতি ছিল, যাদেরকে আপনার পূর্বে রসূল করে প্রেরণ করেছিলাম। (তাঁদের সম্প্রদায় যখন তাঁদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে, তখন তাদেরও সেখানে বাস করার ভাগ্য হয়নি।) আপনি আমার নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম তিন আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। তফসীর মাযহারীতে ঘটনাটি নির্ণয় করার ব্যাপারে কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে।

তন্মধ্যে যুবায়ের ইবনে নুফায়র (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত ঘটনাটি সত্যের অধিক নিকটবর্তী এবং কোরআনের ইঙ্গিত দ্বারা সমর্থিত। ঘটনাটি এই যে, কতিপয় কুরায়শ সরদার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ আপনি যদি বাস্তবিকই আমাদের জন্য প্রেরিত হয়ে থাকেন, তবে আপনার মজলিস থেকে সে সব দুর্দশাগ্রস্ত ছিন্নমূল লোককে বের করে দিন, যাদের সাথে একত্রে বসা আমাদের জন্য অপমানকর। এরূপ করলে আমরাও আপনার সাহাবী ও বন্ধু হয়ে যাব। তাদের এই আবদার শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মনেও কিছুটা কল্পনা জাগে যে এদের দাবী পূরণ করা হলে সম্ভবত এরা মুসলমান হয়ে যাবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খবরদার করা হয়েছে যে, তাদের আবদার একটি ফিতনা এবং তাদের বন্ধুত্বও ফিতনা। আপনি তাদের কথা মেনে নেবেন না। এরপর বলা হয়েছে ঃ যদি আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রশিক্ষণ এবং আপনাকে দৃঢ়পদ রাখার ব্যবস্থা না হত, তবে তাদের আবদারের দিকে ঝুঁকে পড়ার কিছু কাছাকাছি হয়ে যাওয়া আপনার কাছে অসম্ভব ছিল না।

তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে, এ আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, কাফিরদের অনর্থক আবদারের দিকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ঝুঁকে পড়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। হ্যাঁ, ঝুঁকে পড়ার কাছাকাছি হওয়ার সামান্য পরিমাণে সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিষ্পাপ করে এ থেকেও বাঁচিয়ে রেখেছেন। চিন্তা করলে এ আয়াতটি পয়গম্বরদের সুউচ্চ ও পবিত্রতম চরিত্র ও স্বভাবের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। পয়গম্বর-সুলভ পাপমুক্ততা না থাকলেও কাফিরদের অনর্থক আবদারের দিকে ঝুঁকে পড়া পয়-গম্বরের স্বভাবের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। হ্যাঁ, ঝুঁকে পড়ার কিছু কাছাকাছি হওয়ার সামান্য পরিমাণে সম্ভাবনা ছিল। পয়গম্বরসুলভ নিষ্পাপ চরিত্রের কারণে তাও দূর করে দেওয়া হয়েছে।

إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ — অর্থাৎ যদি অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে আপনি তাদের ভ্রান্ত কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকে পড়ার কাছাকাছি হয়ে যেতেন, তবে আপনার শাস্তি ইহকালেও দ্বিগুণ হত এবং মৃত্যুর পর কবর অথবা পরকালেও দ্বিগুণ হত। কেননা, নৈকট্যশীলদের মামুলি ভ্রান্তিকেও বিরাট মনে করা হয়। এ বিষয়বস্তুটি সে বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ, যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পত্নীদের সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে---

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ

অর্থাৎ হে নবী পত্নীরা, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে নির্লজ্জ কাজ করে, তবে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে।

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ — اِسْتِفْزَازٌ --এর শাব্দিক অর্থ, কর্তন করা। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বীয় বাসভূমি মক্কা অথবা মদীনা থেকে বের করে দেওয়া বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কাফিররা আপনাকে নিজ দেশ থেকে বের করে দেওয়ার উপক্রম করেছিল। তারা যদি এরূপ করত, তবে এর শাস্তি ছিল এই যে, তারাও আপনার পরে বেশি দিন এ শহরে বাস করতে পারত না। এটি অপর একটি ঘটনার বর্ণনা, যার নির্ণয়েও দু'রকম রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। একটি মদীনা তাইয়েবার ঘটনা এবং অপরটি মক্কা মোকাররমার। মদীনার ঘটনা এই যে, একদিন মদীনার ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ হে আবুল কাসেম (সা) যদি আপনি নবুওয়তের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তবে সিরিয়ায় গিয়ে বসবাস করাই আপনার পক্ষে সমীচীন। কেননা, সিরিয়াই হবে হাশরের মাঠ এবং সেটাই পয়গম্বরদের বাসভূমি। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মনে তাদের একথা কিছুটা রেখাপাত করে। তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি যখন সিরিয়া সফর করেন, তখন সিরিয়াকে অন্যতম বাসস্থান করার ইচ্ছা তাঁর মনে জাগ্রত হয়। কিন্তু আলোচ্য وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ আয়াতটি নাযিল করে, এতে তাঁকে এ ইচ্ছা বাস্তবায়ন নিষেধ করে দেওয়া হয়। ইবনে কাসীর রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে একে অসন্তোষজনক আখ্যা দিয়েছেন।

তিনি অপর একটি ঘটনার প্রতিও আয়াতের ইঙ্গিত বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি মক্কায় সংঘটিত হয়। সূরাটির মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে শক্তিশালী ইঙ্গিত। ঘটনাটি এই যে, একবার কোরায়েশরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মক্কা থেকে বের করে দেওয়ার ইচ্ছা করে। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে কাফিরদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যদি তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে দেয়, তবে নিজেরাও মক্কায় বেশি দিন সুখে-শান্তিতে টিকতে পারবে না। ইবনে কাসীর আয়াতের ইঙ্গিত হিসাবে এ ঘটনাটিকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন এবং বলেছেন, কোরআন পাকের এই হুঁশিয়ারিও মক্কার কাফিররা খোলা চোখে দেখে নিয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন, তখন মক্কা ওয়ালারা একদিনও মক্কায় আরামে থাকতে পারেনি। মাত্র দেড় বছর পর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বদরের ময়দানে উপস্থিত করে দেন, যেখানে তাদের সত্তর জন সরদার নিহত হয় এবং গোটা শক্তি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর ওহুদ যুদ্ধের শেষ পরিণতিতে তাদের উপর আরও ভয়ভীতি চড়াও হয়ে যায় এবং খন্দক যুদ্ধের সর্বশেষ সংঘর্ষ তো তাদের মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে দেয়। হিজরী অষ্টম বর্ষে রসূলুল্লাহ্ (সা) সমগ্র মক্কা মোকাররমা জয় করে নেন।

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا—এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ নিয়ম পূর্ব থেকেই এরূপ চালু রয়েছে যে, যখন কোন জাতি তাদের পয়গম্বরকে তাঁর

মাতৃভূমি থেকে বের করে দেয়, তখন সেই জাতিকেও সেখানে বেশি দিন টিকিয়ে রাখা হয় না। তাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হয়।

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۭ إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴿٧٨﴾ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿٧٩﴾ وَقُلْ رَّبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا ﴿٨٠﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۭ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿٨١﴾ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

(৭৮) সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন এবং ফজরের কোরআন পাঠও। নিশ্চয় ফযরের কোরআন পাঠ মুখোমুখি হয়। (৭৯) রাত্রির কিছু অংশ কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত। হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মোকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন। (৮০) বলুন ঃ হে পালনকর্তা আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে এবং দান করুন আমাকে নিজের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য। (৮১) বলুন ঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। (৮২) আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি, যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য রহমত। গোনাহ্‌গারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায আদায় করুন (এতে যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা---এই চার ওয়াক্তের নামায এসে গেছে ; যেমন হাদীসে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে) এবং ফজরের নামাযও (আদায় করুন)। নিশ্চয় ফজরের নামায (ফেরেশতাদের) হাজির হওয়ার সময়। ফজরের সময়টি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার সময়। এতে অলসতার আশংকা ছিল, তাই একে আলাদাভাবে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে সাথে এর একটি অতিরিক্ত ফযীলতও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সময়

ফেরেশতারা জমায়েত হয়। হাদীসে এর বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, মানুষের হিফাযত ও আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করার ফেরেশতা, দিনের বেলার আলাদা এবং রাত্রি বেলার আলাদা রয়েছে। ফজরের নামাযের সময় ফেরেশতাদের উভয় দল একত্রিত হয়। রাত্রির ফেরেশতারা নিজেদের কাজ শেষ করা এবং দিনের ফেরেশতারা নিজেদের কাজ শুরু করার জন্য একত্রিত হয়। এমনিভাবে বিকালে আসরের নামাযে উভয় দল একত্রিত হয়। বলা বাহুল্য, ফেরেশতাদের সমাবেশ বরকতের কারণ। এবং রাত্রির কিছু অংশেও (নামায আদায় করুন) অর্থাৎ তাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়ুন, যা আপনার জন্য (পাঁচ ওয়াক্তের নামায ছাড়া) অতিরিক্ত [এই অতিরিক্তের অর্থ, কারও কারও মতে অতিরিক্ত ফরয, যা বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি ফরয করা হয়েছে এবং কারও কারও মতে এর অর্থ নফল]। আশা (অর্থাৎ ওয়াদা) এই যে, আপনার পালনকর্তা আপনাকে 'মকামে মাহমুদে' স্থান দেবেন। ['মকামে মাহমুদের' অর্থ, শাফায়াতে কুবরা বা প্রধান শাফায়েতের মর্তবা---যা হাশরের মাঠে সমগ্র মানব জাতির জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দান করা হবে]। আপনি দোয়া করুনঃ হে আমার পালনকর্তা, (মক্কা থেকে যাওয়ার পর) আমাকে (যেখানে দাখিল করবেন) উত্তমরূপে (অর্থাৎ আরামের সাথে) দাখিল করুন এবং (যখন মক্কা থেকে বের করেন, তখন) আমাকে উত্তমরূপে (অর্থাৎ আরামের সাথে) বের করুন এবং আমাকে নিজের কাছ থেকে (কাফিরদের বিরুদ্ধে) এমন বিজয় দান করুন, যার সাথে (আপনার) সাহায্য থাকে; যদ্দরুন সে বিজয় দীর্ঘস্থায়ী ও উন্নত হয়। নতুবা সাময়িক বিজয় তো কোন সময় কাফিররাও লাভ করে। কিন্তু তার সাথে আল্লাহ্র সাহায্য থাকে না। ফলে দীর্ঘস্থায়ীও হয় না)। বলে দিনঃ (ব্যস এখন) সত্য (ধর্ম বিজয়ের পথে) এসে গেছে (এবং বাতিল বিলীন হওয়ার পথে। বাস্তবিক বাতিল তো ক্ষণভঙ্গুরই হয়। হিজরতের পর মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে এসব ওয়াদা পূর্ণ হয়ে যায়)। আমি এমন বস্তু অর্থাৎ কোরআন নাযিল করি, যা ঈমানদারদের জন্য রোগের সুচিকিৎসা ও রহমত। (কেননা তারা একে মানে ও এর নির্দেশমত কাজ করে। ফলে তাদের প্রতি রহমত হয় এবং তারা মিথ্যা বিশ্বাস এবং দুষ্ট কল্পনার কবল থেকে আরোগ্য লাভ করে)। জালিমদের তো এর দ্বারা ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়। (কেননা তারা যখন কোরআনকে অমান্য করে, তখন আল্লাহ্ ক্রোধ ও গযবের যোগ্য হয়ে যায়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শত্রুদের দুরভিসন্ধি থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার নামায ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে শত্রুদের বিরোধিতা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিভিন্ন প্রকার কষ্টে পতিত করার অপচেষ্টা এবং এর জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নামায কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শত্রুদের দুরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার হচ্ছে নামায কায়েম করা। সূরা হিজরের আয়াতে আরও স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ -

অর্থাৎ আমি জানি যে, কাফিরদের পীড়াদায়ক কথা-বার্তা শুনে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।---(কুরতুবী)

এ আয়াতে আল্লাহ্‌র যিকর, প্রশংসা, তসবীহ্ ও নামাযে মশগুল হয়ে যাওয়াকে শত্রুদের উৎপীড়নের প্রতিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র যিকর ও নামায বিশেষভাবে এ থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার। এ ব্যাখ্যাও অবান্তর নয় যে, শত্রুদের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করা আল্লাহ্‌র সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভ করার উত্তম পন্থা হচ্ছে নামায ; যেমন কোরআন পাক বলে ঃ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

অর্থাৎ সবর ও নামায দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর।

পাঞ্জেগানা নামাযের নির্দেশ ঃ সাধারণ তফসীরবিদের মতে এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ। কেননা, دلوك শব্দের অর্থ, আসলে ঝুঁকে পড়া। সূর্যের ঝুঁকে পড়া তখন শুরু হয় যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, সূর্যাস্তকেও دلوك বলা যায়। কিন্তু সাধারণ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ স্থলে শব্দের অর্থ সূর্যের ঢলে পড়াই নিয়েছেন।---(কুরতুবী, মাযহারী, ইবনে কাসীর)

غسق—اِلٰى غَسَقِ اللَّيْلِ শব্দের অর্থ রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া। ইমাম মালিক হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এ তফসীর বর্ণনা করেছেন।

এভাবে دُلُوكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ اللَّيْلِ-এর মধ্যে চারটি নামায এসে গেছে ঃ যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। এদের মধ্যে দু'নামাযের প্রথম ওয়াক্তও বলে দেওয়া হয়েছে যে, যোহরের প্রথম ওয়াক্ত সূর্য ঢলার সময় থেকে শুরু হয় এবং এশার সময় غسق ليل অর্থাৎ অন্ধকার পূর্ণ হয়ে গেলে হয়। একারণেই ইমাম আযম আবূ হানীফা সে সময়কে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন, যখন সূর্যাস্তের লাল আভার পর সাদা আভাও অস্তমিত হয়। এটা সবারই জানা যে, সূর্যাস্তের পর পর পশ্চিম দিগন্তে লাল আভা দেখা দেয়। এরপর এক প্রকার সাদা আভা দিগন্তে ছড়িয়ে থাকে। এরপর এই সাদা আভাও অস্তমিত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, দিগন্তের শুভ্র আভা শেষ

হয়ে গেলেই রাত্রির অন্ধকার পূর্ণতা লাভ করে। তাই আয়াতের এই শব্দের মধ্যে ইমাম আবূ হানিফার মাযহাবের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অন্য ঈমামগণ লাল আভা অস্তমিত হওয়াকে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন এবং একই غسق الليل-এর তফসীর স্থির করেছেন।

وقرآن الفجر—এখানে قرآن শব্দ বলে নামায বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন নামাযের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ইবনে কাসীর, কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থই লিখেছেন। কাজেই আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, دلوك الشمس الى غسق الليل বাক্যে চার নামাযের বর্ণনা ছিল এবং এতে পঞ্চম নামাযের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। একে আলাদা করে বর্ণনা করার মধ্যে এই নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

كان مشهودا—شهد ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। অর্থ, উপস্থিত হওয়া সহীহ্ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী এ সময় দিবা-রাত্রির উভয় দল ফেরেশতা নামাযে উপস্থিত হয়। তাই একে مشهود বলা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে পাঞ্জেগানা নামাযের নির্দেশ সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ণ তফসীর ও ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ্ (সা) কথা ও কাজ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নামায আদায়ই করতে পারে না। জানিনা, যারা কোরআনকে হাদীস ও রসূলের বর্ণনা ছাড়াই বোঝার দাবী করে তারা নামায কিভাবে পড়ে? এমনিভাবে এ আয়াতে নামাযে কোরআন পাঠের কথাও সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। এর বিবরণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কথা ও কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে; অর্থাৎ ফজরের নামাযে সামর্থ্যানুযায়ী দীর্ঘ কিরাআত করতে হবে। মাগরিবে দীর্ঘ কিরাআত এবং ফজরে সংক্ষিপ্ত কিরাআতের কথা কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু তা কার্যত পরিত্যক্ত। সহীহ্ মুসলিমের যে রেওয়ায়েতে মাগরিবের নামাযে সূরা আ'রাফ, মুরসালাত ইত্যাদি দীর্ঘ সূরা পাঠ করা এবং ফজরের নামাযে শুধু 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' পাঠ করার কথা বর্ণিত আছে, ইমাম কুরতুবী সেই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেছেন ঃ

فمتروك بالعمل و لانكار على معاذ التطويل و بامره الائمة بالتخفيف—অর্থাৎ মাগরিবে দীর্ঘ কিরাআত ও ফজরে সংক্ষিপ্ত কিরাআতের এসব কদাচিৎ ঘটনা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সার্বক্ষণিক আমল ও মৌখিক উক্তি দ্বারা পরিত্যক্ত।

তাহাজ্জুদ নামাযের সময় ও বিধানাবলী ঃ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ

تَهَجُّد—শব্দটি هُجُود থেকে উদ্ভূত। নিদ্রা যাওয়া ও জাগ্রত হওয়া এই পরস্পর-বিরোধী দুই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, রাত্রির কিছু অংশে কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। কেননা, بِهٖ- এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হয়েছে। (মাযহারী) কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকার অর্থ নামায পড়া। এ কারণেই শরীয়তের পরিভাষায় রাত্রিকালীন নামাযকে 'নামাযে তাহাজ্জুদ' বলা হয়। সাধারণত এর অর্থ এরূপ নেওয়া হয় যে, কিছুক্ষণ নিদ্রা হওয়ার পর যে নামায পড়া হয় তাই তাহাজ্জুদের নামায। কিন্তু তফসীর মাযহারীতে রয়েছে, আয়াতের অর্থ এতটুকুই যে, রাত্রির কিছু অংশ নামায পড়ার জন্য নিদ্রা ত্যাগ কর। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হয়ে নামায পড়লে যেমন এই অর্থ ঠিক থাকে, তেমনি প্রথমেই নামাযের জন্য নিদ্রাকে পিছিয়ে নিলেও এ অর্থের ব্যতিক্রম হয় না। তাই তাহাজ্জুদের জন্য প্রথমে নিদ্রা যাওয়ার শর্ত কোরআনের অভিপ্রেত অর্থ নয়। এরপর কোন কোন হাদীস দ্বারা তাহাজ্জুদের এই সাধারণ অর্থ প্রমাণ করা হয়েছে।

ইবনে কাসীর হযরত হাসান বসরী (রহ) থেকে তাহাজ্জুদের যে সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন, তাও এই ব্যাপক অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে কাসীর লেখেন ঃ

قال الحسن البصرى هو ما كان بعد العشاء ويحمل على ما كان بعد النوم অর্থাৎ হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ এশার পরে পড়া হয় এমন প্রত্যেক নামাযকে তাহাজ্জুদ বলা যায়। তবে প্রচলিত পদ্ধতির কারণে কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর পড়ার অর্থে বোঝা দরকার।

এর সারমর্ম এই যে, তাহাজ্জুদের আসল অর্থে নিদ্রার পরে হওয়ার শর্ত নেই এবং কোরআনের ভাষায়ও এরূপ শর্তের অস্তিত্ব নেই ; কিন্তু সাধারণত রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম শেষরাত্রে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। তাই এভাবে পড়াই উত্তম হবে।

তাহাজ্জুদ ফরয না নফল ? ঃ نَافِلَةً لَّكَ—نافلة نفل শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত। একারণেই যেসব নামায ও সদকা-খয়রাত ওয়াজিব ও জরুরী নয়---করলে সওয়াব পাওয়া যায় এবং না করলে গোনাহ্ নাই, সেগুলোকে নফল বলা হয়। আয়াতে নামাযে তাহাজ্জুদের সাথে نافلة لك শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় বাহ্যত বোঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য নফল। অথচ এটা সমগ্র উম্মতের জন্যও নফল। এজন্যই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে نافلة শব্দটিকে فريضة- এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ এরূপ স্থির করেছেন যে, সাধারণ

উম্মতের ওপর তো শুধু পাঞ্জেগানা নামাযই ফরয; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) র ওপর তাহাজ্জুদও একটি অতিরিক্ত ফরয। অতএব এখানে نافلة শব্দের অর্থ, অতিরিক্ত ফরয ---নফলের সাধারণ অর্থে নয়।

এ ব্যাপারে সুচিন্তিত বক্তব্য এই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সূরা মুযাম্মেল অবতীর্ণ হয়, তখন পাঞ্জেগানা নামায ফরয ছিল না, শুধু তাহাজ্জুদের নামায সবার ওপর ফরয ছিল। সূরা মুযাম্মেলে এর উল্লেখ রয়েছে। এরপর শবে মি'রাজে যখন পাঞ্জেগানা নামায ফরয করা হয়, তখন তাহাজ্জুদের ফরয নামায সাধারণ উম্মতের পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে রহিত হয়ে যায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পক্ষেও রহিত হয় কি না, সে ব্যাপারে মতভেদ থেকে যায়। আলোচ্য আয়াতের نافلة لك বাক্যের অর্থ তাই এই যে, তাহাজ্জুদের নামায রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পক্ষে একটি অতিরিক্ত ফরয। কিন্তু তফসীরে কুরতুবীতে কয়েক কারণে এ বক্তব্যকে অশুদ্ধ বলা হয়েছে। এক. ফরযকে নফল শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কোন কারণ নেই। যদি রূপক অর্থ বলা হয়, তবে এটি এমন একটি রূপক অর্থ হবে, যার কোন প্রকৃত অর্থ নেই। দুই. সহীহ্ হাদীসসমূহে শুধু পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এক হাদীসের শেষে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শবে মি'রাজে প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেওয়া হয়। এখানে যদিও সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে; কিন্তু সওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই পাওয়া যাবে। এরপর বলা হয়েছে ঃ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ — অর্থাৎ আমার কথা পরিবর্তিত হয় না। যখন পঞ্চাশ ওয়াক্তের নির্দেশ দিয়েছিলাম, তখন সওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই দেওয়া হবে, যদিও কাজ হাল্কা করে দেওয়া হয়েছে।

এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, সাধারণ উম্মত এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর পাঞ্জেগানা নামায ছাড়া কোন নামায ফরয ছিল না। আরও এক কারণ এই যে, نافلة শব্দটি যদি এখানে অতিরিক্ত ফরযের অর্থে হত, তবে এর পরে لك শব্দের পরিবর্তে عليك হওয়া উচিত ছিল, যা ওয়াজিব হওয়ার অর্থ দেয়। لك তো শুধু জায়েয হওয়া ও অনুমতির অর্থ বুঝায়।

তফসীর মাযহারীতে এ ব্যাখ্যাকেই বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ফরয নামায যখন উম্মতের পক্ষে রহিত হয়ে যায়, তখন তা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পক্ষেও রহিত হয়ে যায় এবং সবার জন্য নফল থেকে যায়। কিন্তু এমতাবস্থায় প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তাহলে نافلة لك বলার কি মানে হবে? তাহাজ্জুদ তো সবার জন্যই নফল। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বৈশিষ্ট্য কি? উত্তর এই যে, হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী সমগ্র উম্মতের নফল ইবাদত তাদের গোনাহের কাফফারা এবং ফরয নামায-সমূহের ত্রুটি পূরণের উপকারে লাগে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) গোনাহ্ থেকে এবং ফরয

নামাযের ত্রুটি থেকেও মুক্ত। কাজেই তাঁর পক্ষে নফল ইবাদত সম্পূর্ণ অতিরিক্ত বৈ নয়। তাঁর নফল ইবাদত কোন ত্রুটি পূরণের জন্য নয়; বরং তা শুধু অধিক নৈকট্য লাভের উপায়।---(কুরতুবী, মাযহারী)

তাহাজ্জুদ নফল, না সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ ঃ ফিকাহ্‌বিদদের মতে সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্‌র সাধারণ সংজ্ঞা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যে কাজ স্থায়ীভাবে করেছেন এবং বিনা ওযরে ত্যাগ করেননি, তাই সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্। তবে যদি কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা বোঝা যায় যে, কাজটি একান্তভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-রই বৈশিষ্ট্য---সাধারণ উম্মতের জন্য নয়, তবে তা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্ নয়। এই সংজ্ঞার বাহ্যিক তাগিদ এই যে, তাহাজ্জুদও সবার জন্য সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্ হওয়া চাই, শুধু নফল নয়। কেননা, তাহাজ্জুদের নামায স্থায়ীভাবে পড়া রসূলুল্লাহ (সা) থেকে মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য হওয়ারও কোন প্রমাণ নেই। তফসীরে মাযহারীতে একেই পছন্দনীয় ও অগ্রগণ্য উক্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এর পক্ষে হযরত ইবনে মাসউদের একটি হাদীসও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, যে পূর্বে তাহাজ্জুদের নামায পড়ত এবং পরে ত্যাগ করে। তিনি উত্তরে বললেন ঃ তার কর্ণকুহরে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে। এ ধরনের বিরূপ মন্তব্য ও হুঁশিয়ারি শুধু নফলের জন্য হতে পারে না। এতে বোঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্।

যারা তাহাজ্জুদকে শুধু নফল মনে করেন, তারা স্থায়ীভাবে তাহাজ্জুদ পড়াকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করেছেন। উপরোক্ত হাদীসে তাহাজ্জুদ তরক করার কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) যে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, এটা প্রকৃতপক্ষে নিছক তরক করার কারণে নয়; বরং প্রথমে অভ্যাস গড়ে তোলার পর তরক করার কারণে। কেননা, একবার কোন নফলের অভ্যাস করার পর তা নিয়মিতভাবে পালন করে যাওয়া সবার মতেই বাঞ্ছনীয়। অভ্যাস গড়ে তোলার পর ত্যাগ করা নিন্দনীয়। কেননা, অভ্যাসের পর বিনা ওযরে ত্যাগ করা এক প্রকার বিমুখতার লক্ষণ। যে ব্যক্তি প্রথম থেকেই অভ্যাস করে না, সে নিন্দার পাত্র নয়।

তাহাজ্জুদের রাকআত সংখ্যা ঃ সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) রমযানে অথবা রমযানের বাইরে কোন সময় এগার রাকআতের বেশি পড়তেন না। তন্মধ্যে হানাফীদের মতে তিন রাকআত ছিল বিতরের নামায এবং অবশিষ্ট আট রাকআত তাহাজ্জুদের।

মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) রাত্রে তের রাকআত পড়তেন। বিতেরের তিন রাকআত এবং ফজরের দুই রাকআত সুন্নতও এর অন্তর্ভুক্ত (মাযহারী) রমযানের কারণে ফজরের সুন্নতকে রাত্রিকালীন নামাযের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। এসব রিওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, তাহাজ্জুদের নামায আট রাকআত পড়াই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাধারণ অভ্যাস ছিল।

কিন্তু হযরত আয়েশা (রা)-রই অপর এক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, মাঝে মাঝে উপরোক্ত সংখ্যা থেকে কম চার অথবা ছয় রাকআতও পড়েছেন, যেমন সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতে মসরুক (রা) হযরত আয়েশাকে তাহাজ্জুদের নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেনঃ সাত, নয় ও এগার রাকআত হত ফজরের সুন্নত ছাড়া। (মাযহারী) হানাফী নিয়ম অনুযায়ী বেতেরের তিন রাকআত বাদ দিলে সাতের মধ্যে চার, নয়ের মধ্যে ছয় এবং এগারর মধ্যে আট তাহাজ্জুদের রাকআত থেকে যায়।

তাহাজ্জুদের নামায পড়ার নিয়মঃ বিভিন্ন হাদীস থেকে যা প্রমাণিত আছে, তা এই যে, প্রথমে দু'রাকআত হালকা ও সংক্ষিপ্ত কিরাআতে অতঃপর অবিশিষ্ট রাকআত-গুলোতে কিরাআতও দীর্ঘ এবং রুকূ-সিজদাও দীর্ঘ করা হত। মাঝে মাঝে খুব বেশি দীর্ঘ করা হত এবং মাঝে মাঝে কম। (এ হচ্ছে ঐসব হাদীসের সংক্ষিপ্ত সার, যেগুলো তফসীর মাযহারীতে উদ্ধৃত করা হয়েছে।)

'মকামে মাহমুদ'ঃ আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মকামে মাহমুদের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এই মকাম রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট---অন্য কোন পয়গম্বরের জন্য নয়। এর তফসীর প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সহীহ্ হাদীসসমূহে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ হচ্ছে শাফাআতে কুবরার মকাম। হাশরের ময়দানে যখন সমগ্র মানব জাতি একত্রিত হবে এবং প্রত্যেক পয়গম্বরের সমীপে শাফাআতের দরখাস্ত করবে, তখন সব পয়গম্বরই ওযর পেশ করবেন। একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা)-ই এই মহান সম্মান লাভ করবেন এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য শাফাআত করবেন। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর ও তফসীর মাযহারীতে লিখিত রেওয়ায়েত সমূহের বিবরণ নাতিদীর্ঘ।

পয়গম্বর ও সৎলোকদের শাফাআত গ্রহণীয় হবেঃ ইসলামী উপদল সমূহের মধ্যে খারেজী ও মুতাযিলা সম্প্রদায় পয়গম্বরদের শাফাআত স্বীকার করে না। তারা বলেঃ কবিরা গোনাহ্ কারও শাফাআত দ্বারা মাফ হবে না। কিন্তু মুতাওয়াতির হাদীসসমূহ সাক্ষ্য দেয় যে, পয়গম্বরগণের এমন কি, সৎলোকদেরও শাফাআত গোনাহ্গারদের পক্ষে কবুল করা হবে। অনেক মানুষের গোনাহ শাফাআতের ফলে মাফ হয়ে যাবে।

ইবনে মাজা ও বায়হাকীতে হযরত উসমান (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম পয়গম্বরগণ গোনাহ্গারদের জন্য শাফায়াত করবেন, এরপর আলিমগণ, এরপর শহীদগণ শাফাআত করবেন। দায়লমী হযরত ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ "আলিমকে বলা হবে, আপিনি স্বীয় শিষ্যদের জন্য শাফায়াত করতে পারেন, যদিও তাদের সংখ্যা আকাশের তারকাসমূহের সমান।"

আবূ দাউদ ও ইবনে হাইয়ান আবূদ্দারদার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, শহীদের শাফাআত তার পরিবারের সত্তর জনের জন্য কবুল করা হবে।

হযরত আবূ উমামার রেওয়ায়েতে বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার উম্মতের এক ব্যক্তির শাফায়াতের ফলে রবিয়া ও মুযার গোত্রের সমগ্র জনগোষ্ঠীর চাইতে বেশী লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে।---(মসনদে আহমদ, তাবারানী, বায়হাকী)।

একটি প্রশ্ন ও উত্তর ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, যখন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) শাফাআত করবেন এবং তাঁর শাফাআতের ফলে কোন ঈমানদার দোযখে থাকবে না, তখন আলিম ও সৎলোকদের শাফাআত কেন এবং কিভাবে হবে? তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে, সম্ভবত আলিম ও সৎলোকদের মধ্যে যারা শাফাআত করতে চাইবেন, তারা নিজ নিজ শাফাআত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পেশ করবেন। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র দরবারে শাফাআত করবেন।

ফায়দা ঃ এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ شفاعتی لاهل الکبائر من امتی অর্থাৎ আমার শাফাআত তাদের জন্য হবে, আমার উম্মতের মধ্যে থেকে যারা কবীরা গোনাহ্ করেছিল। এ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বিশেষভাবে কবিরা গোনাহ্গারদের জন্য শাফাআত করবেন। কোন ফেরেশতা অথবা উম্মতের কোন ব্যক্তি তাদের জন্য শাফাআত করতে পারবে না। বরং উম্মতের সৎকর্মশীলদের শাফাআত সগীরা গোনাহ্গারদের জন্য হবে।

শাফাআতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদের নামাযের বিশেষ প্রভাব আছে ঃ হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র) বলেন ঃ এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রথমে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; অতঃপর মকামে মাহমুদ অর্থাৎ শাফাআতে কুবরার ওয়াদা করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, শাফাআতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদের নামাযের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান।

وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي — পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথমে মক্কার কাফিরদের উৎপীড়ন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেওয়ার অপকৌশলের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এর সাথে একথাও বলা হয়েছিল যে, তাদের এসব অপকৌশল সফল হবে না। তাদের মুকাবিলায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আসল তদবীরের পর্যায়ে শুধু পাঞ্জেগানা নামায কায়েম করা ও তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর পরকালে তাঁকে সব পয়গম্বরের তুলনায় উচ্চ মকাম অর্থাৎ 'মকামে মাহমুদ' দান করার ওয়াদা করা হয়েছে; এ ওয়াদা পরকালে পূর্ণ হবে। আলোচ্য وَقُل رَّبِّ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইহকালেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাফিরদের দুরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তি দেওয়ার কৌশল মদীনায় হিজরতের আকারে ব্যক্ত করেছেন, অতঃপর وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ — আয়াতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ দান করেছেন।

তিরমিযীর রিওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় ছিলেন, অতঃপর তাঁকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয়ঃ

وَقُلْ رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ---এখানে مُدْخَل ও مُخْرَج--এর অর্থ, প্রকাশ করার স্থান ও বহির্গমনের স্থান। উভয়ের সাথে صِدْقٍ বিশেষণ যুক্ত হওয়ার অর্থ এই যে, এই প্রবেশ ও বহির্গমন সব আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী উত্তম পন্থায় হোক। কেননা, আরবী ভাষায় صِدْق এমন কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা বাহ্যত ও অন্তরগত উভয় দিক দিয়ে সঠিক ও উত্তম হবে। কোরআন পাকে قَدَمَ صِدْقٍ لِسَانَ صِدْقٍ ও مَقْعَدِ صِدْقٍ শব্দগুলো এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

'প্রবেশ করার স্থান' বলে মদীনা এবং বহির্গমনের স্থান বলে মক্কা বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হে আল্লাহ্ মদীনায় আমার প্রবেশ উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। সেখানে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে এবং মক্কা থেকে আমার বের হওয়া উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। মাতৃভূমি এবং বাড়ী-ঘরের মহব্বতে অন্তর যেন জড়িয়ে না পড়ে। এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে আরও বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু এই তফসীরটি হযরত হাসান বসরী ও কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত রয়েছে। ইবনে কাসীর একে সর্বাধিক বিশুদ্ধ তফসীর আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে জরীরও এ তফসীরই গ্রহণ করেছেন। তবে এখানে প্রথমে বহির্গমনের স্থান ও পরে প্রবেশ করার স্থান উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। এই ক্রম উল্টিয়ে দেয়ার মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, মক্কা থেকে বের হওয়া স্বয়ং কোন লক্ষ্য ছিল না; বরং বায়তুল্লাহকে ত্যাগ করে যাওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয় ছিল। অবশ্য ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য শান্তির আবাসস্থল খোঁজ করা ছিল এখানে লক্ষ্য। মদীনা প্রবেশের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার আশা ছিল। তাই লক্ষ্যবস্তুকেই অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের জন্য মকবুল দোয়াঃ হিজরতের সময় আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ দোয়াটি শিক্ষা দেন যে, মক্কা থেকে বহির্গমন এবং মদীনায় পৌঁছা উভয়টি উত্তমভাবে ও নিরাপদে সম্পন্ন হোক। এ দোয়ার ফলেই হিজরতের সময় পশ্চাদ্ধাবনকারী কাফিরদের কবল থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে প্রতি পদক্ষেপে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং মদীনাকে বাহ্যত ও অন্তরগত উভয় দিক দিয়েই তাঁর জন্য ও মুসলমানদের জন্য উপযোগী করেছেন। এ কারণেই কোন আলিম বলেনঃ এই দোয়াটি লক্ষ্য অর্জনের শুরুতে প্রত্যেক মুসলমানদের মনে রাখা উচিত। প্রত্যেক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দোয়াটি উপকারী। পরবর্তী বাক্য وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا এ

দোয়ারই পরিশিষ্ট। হযরত কাতাদাহ্ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) জানতেন যে, শত্রুদের চক্রান্ত-জালের মধ্যে অবস্থান করে রিসালতের কর্তব্য পালন সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই তিনি আল্লাহ্র দরবারে বিজয় ও সাহায্যের দোয়া করেন, যা কবুল হয় এবং এর শুভফল সবার দৃষ্টিগোচর হয়।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ——এ আয়াতটি হিজরতের পর মক্কা বিজয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন বায়তুল্লাহ্র চতুষ্পার্শ্বে তিন শ' ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। এই বিশেষ সংখ্যার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কোন কোন আলিম বলেন ঃ বছরের প্রত্যেক দিনের জন্য মুশরিকদের আলাদা আলাদা মূর্তি ছিল এবং তারা প্রত্যহ নির্ধারিত মূর্তিরই উপাসনা করত। (কুরতুবী) রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সেখানে পৌঁছেন, তখন তাঁর মুখে এ আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ এবং তিনি স্বীয় ছড়ি দ্বারা প্রত্যেক মূর্তির বক্ষে আঘাত করে যাচ্ছিলেন। (বুখারী, মুসলিম)

কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে, ঐ ছড়ির নিচ দিকে রাঙ্গতা অথবা লোহার রজত ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কোন মূর্তির বুকে আঘাত করতেন, তখন তা উল্টে পড়ে যেত। এভাবে সব মূর্তিই ভূমিসাৎ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সেগুলো ভেঙ্গে চুরমার করার আদেশ দেন।—(কুরতুবী)

শিরক ও কুফরের চিহ্ন মিটিয়ে দেওয়া ওয়াজিব ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ এ আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, মুশরিকদের মূর্তি ও অন্যান্য মুশরিকসুলভ চিহ্ন মিটিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। যেসব হাতিয়ার যন্ত্রপাতি গোনাহ্র কাজে ব্যবহৃত হয়, সেগুলো মিটিয়ে দেওয়াও এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে মুনযির বলেন ঃ কাষ্ঠ, পিতল ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পও মূর্তির অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ্ (সা) রঙবেরঙের চিত্র অংকিত পর্দা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। এ থেকে সাধারণ চিত্রের বিধান জানা যায়। হযরত ঈসা (আ) যখন শেষ যমানায় আগমন করবেন, তখন সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী খৃস্টানদের ক্রুশ ভেঙ্গে দেবেন এবং শূকর হত্যা করবেন। শিরক, কুফর ও বাতিলের আসবাবপত্র ভেঙ্গে দেওয়া যে ওয়াজিব, এসব বিষয় তারই প্রমাণ।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ১৮২——কোরআন পাক যে অন্তরের ঔষধ এবং শিরক, কুফর, কুচরিত্র ও আত্মিক রোগসমূহ থেকে মনের মুক্তিদাতা, এটা সর্বজন স্বীকৃত সত্য। কোন কোন আলিমের মতে কোরআন যেমন আত্মিক রোগসমূহের ঔষধ,

তেমনি বাহ্যিক রোগসমূহের অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। কোরআনের আয়াত পাঠ করে রোগীর গায়ে ফুঁ দেওয়া এবং তাবিজ লিখে গলায় ঝুলানো বাহ্যিক রোগ নিরাময়ের কারণ হয়ে থাকে। হাদীসের অনেক রেওয়ায়েত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আবূ সাঈদ খুদরীর এই হাদীস সব গ্রন্থেই বিদ্যমান দেখা যায় যে, সাহাবীদের একটি দল একবার সফররত ছিলেন। কোন এক গ্রামের জনৈক এক সরদারকে বিচ্ছু দংশন করলে লোকেরা সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনারা এই রোগীর চিকিৎসা করতে পারেন কি? সাহাবীরা সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করে রোগীর গায়ে ফুঁ দিলে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি এ কার্যক্রমকে জায়েয বলে মত প্রকাশ করেন।

এমনিভাবে আরও অনেক হাদীস থেকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র 'কুল আউযু' শীর্ষক সূরা সমূহ পাঠ করে ফুঁ দেওয়ার প্রমাণ পওয়া যায়। সাহাবী ও তাবেয়ীগণও কোরআনের আয়াত দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। এ আয়াতের অধীনে কুরতুবী এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

وَلَا يَزِيدُ الظّٰلِمِينَ اِلَّا خَسَارًا —এ থেকে জানা যায় যে, বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে কোরআন পাঠ করলে যেমন কোরআন রোগের চিকিৎসা হয়ে থাকে তেমনি অবিশ্বাস এবং কোরআনের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন ক্ষতি ও বিপদাপদের কারণও হয়ে থাকে।

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوْسًا ﴿٨٣﴾ قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ۭ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿٨٤﴾

(৮৩) আমি মানুষকে নিয়ামত দান করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকারে দূরে সরে যায়; যখন তাকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। (৮৪) বলুন ঃ প্রত্যেকেই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করে। অতঃপর আপনার পালনকর্তা বিশেষরূপে জানেন, কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে আছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (কতক) মানুষ (অর্থাৎ কাফির এমন যে, তাদের)-কে যখন আমি নিয়ামত দান করি, তখন (আমার দিক থেকে এবং আমার নির্দেশাবলীর দিক থেকে তারা) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পাশ কেটে যায় এবং যখন তাদেরকে কোন কষ্ট স্পর্শ করে, তখন (রহমত থেকে সম্পূর্ণ) নিরাশ হয়ে যায়। (উভয় অবস্থা আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কহীনতার

প্রমাণ। এটাই কুফর ও পথভ্রষ্টতার ভিত্তি।) আপনি বলে দিনঃ ('মু'মিন কাফির, সৎ লোক ও অসৎ লোকদের মধ্য থেকে) প্রত্যেকেই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করছে (অর্থাৎ নিজ নিজ বিশুদ্ধ বিবেক-বুদ্ধি অবলম্বন করছে এবং জ্ঞান অথবা মূর্খতার ভিত্তিতে বিভিন্ন রকম কাজ করছে।) অতএব, আপনার পালনকর্তা বিশেষভাবে জানেন, কে অধিক সঠিক পথে আছে। (এমনিভাবে যে সঠিক পথে নয়, তাকেও জানেন। তিনি প্রত্যেককে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান অথবা শাস্তি দেবেন। এরূপ নয় যে, যার মনে চাইবে কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে নিজেকে সঠিক পথের অনুসারী মনে করে নেবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كُلٌّ يَعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ—এখানে شَاكِلَة শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে স্বভাব, অভ্যাস, প্রকৃতি, নিয়ত, রীতি ইত্যাদি বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সবগুলোর সারমর্ম, পরিবেশ। অভ্যাস এবং প্রথা ও প্রচলনের দিক দিয়ে প্রত্যেক মানুষের একটি অভ্যাস ও মানসিকতা গড়ে উঠে। এই অভ্যাস ও মানসিকতা অনুযায়ী তার কাজকর্ম হয়ে থাকে। ---(কুরতুবী) এতে মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, মন্দ পরিবেশ, মন্দ সংসর্গ ও মন্দ অভ্যাস থেকে বিরত থাকা দরকার এবং সৎ লোকদের সংসর্গ ও সৎ অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। (জাসসাস) কেননা, পরিবেশ সংসর্গ এবং প্রথা ও প্রচলিত রীতি দ্বারা মানুষের যে স্বভাব গড়ে উঠে, তার প্রত্যেক কাজ তদনুযায়ীই হয়ে থাকে। ইমাম জাসসাস এস্থলে شَاكِلَة-এর এক অর্থ, সমভাবাপন্নও উল্লেখ করেছেন। এদিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমভাবাপন্ন ব্যক্তির সাথে অন্তরঙ্গ হয়। সাধু সাধুর সাথে এবং দুষ্ট দুষ্টের সাথে অন্তরঙ্গ হয় এবং তারই কর্মপন্থা অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত উক্তি এর নজীরঃ

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ—অর্থাৎ ভ্রষ্টা নারী ভ্রষ্টা পুরুষদের জন্য এবং পবিত্রা নারী পবিত্র পুরুষদের জন্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ পুরুষ ও নারীর সাথে অন্তরঙ্গ হয়। এর সারমর্মও এই যে, খারাপ সংসর্গ ও খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকার প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۭ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ
الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ وَلَىِٕنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا
تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ۝ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۭ اِنَّ فَضْلَهٗ
كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ۝ قُلْ لَّىِٕنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ

يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظَهِيْرًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ
فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۝

(৮৫) তারা আপনাকে 'রূহ্' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন ঃ রূহ্ আমার পালনকর্তার আদেশঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারিতাম। অতঃপর আপনি নিজের জন্য তা আনয়নের ব্যাপারে আমার মুকাবিলায় কোন দায়িত্ব বহনকারী পাবেন না। (৮৭) এ প্রত্যাহার না করা আপনার পালনকর্তার মেহেরবানি। নিশ্চয় আপনার প্রতি তাঁর করুণা বিরাট। (৮৮) বলুন ঃ যদি মানব ও জিন এই কোরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না। (৮৯) আমি এই কোরআনে মানুষকে বিভিন্ন উপকার দ্বারা সব রকম বিষয়বস্তু বুঝিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকেনি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং তারা আপনাকে (পরীক্ষার্থে) রূহ্ সম্পর্কে (অর্থাৎ রূহের স্বরূপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি (উত্তরে) বলে দিন ঃ রূহ্ (সম্পকে এতটুকু বুঝে নাও যে, সেটা এমন এক বস্তু, যা) আমার পালনকর্তার আদেশ দ্বারা গঠিত এবং (এর বিস্তারিত স্বরূপ সম্পর্কে) তোমাদেরকে খুব কম জ্ঞান (তোমাদের বোধশক্তি ও প্রয়োজন পরিমাণে) দান করা হয়েছে। (রূহের স্বরূপ জানা আবশ্যকীয় বিষয় নয় এবং এর স্বরূপ সাধারণভাবে হৃদয়ঙ্গমও হতে পারে না। তাই কোরআন এর স্বরূপ বর্ণনা করে না।) যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে আপনার কাছে যে পরিমাণ ওহী প্রেরণ করেছি (এবং এর মাধ্যমে আপনাকে জ্ঞান দান করেছি) সব উঠিয়ে নিতে পারি। অতঃপর আপনি তার (এই ওহী ফিরিয়ে আনার) জন্য আমার মুকাবিলায় কোন সমর্থকও পাবেন না ; কিন্তু (এটা) আপনার পালনকর্তারই দয়া (যে, এরূপ করেননি)। নিশ্চয় আপনার প্রতি তাঁর বড় করুণা। (উদ্দেশ্য এই যে, রূহ্ ইত্যাদির প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান হওয়া দূরের কথা, মানুষকে ওহীর মাধ্যমে যে যৎ-সামান্য জ্ঞান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে, তাও তার কোন জায়গির নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে দেয়ার পরও ছিনিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু তিনি রহমতবশত এরূপ করেন না। কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ্র বড় করুণা।) আপনি বলে দিন ঃ যদি সমস্ত মানব ও জিন এই কোরআনের অনুরূপ কালাম রচনা করে আনার

জন্য জড়ো হয়, তবুও তারা তা করতে পারবে না, যদিও একে অপরের সাহায্যকারীও হয়ে যায়। (অর্থাৎ তাদের মধ্যে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা চেষ্টা করে সফল হওয়া দূরের কথা, সবাই একে অপরের সাহায্য করেও কোরআনের অনুরূপ রচনা করতে পারবে না।) আমি লোকদের (কে বোঝাবার) জন্য কোরআনে সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু নানাভাবে বর্ণনা করেছি। তবুও অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকে নি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রথম আয়াতে রূহ্ সম্পর্কে কাফিরদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব উল্লিখিত হয়েছে। রূহ্ শব্দটি অভিধান, বাকপদ্ধতি এবং কোরআন পাকে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ তাই যা এ শব্দ থেকে সাধারণভাবে বোঝা যায়; অর্থাৎ প্রাণ, যার বদৌলতে জীবন কায়েম রয়েছে। কোরআন পাকে এ শব্দটি জিবরাঈলের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ — এবং হযরত ঈসা (আ)-এর জন্যও কয়েক আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। এমন কি, স্বয়ং কোরআন ও ওহীকেও রূহ্ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে; যেমন أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا

রূহ্ বলে কি বোঝানো হয়েছে ঃ এ বিষয়ই এখানে প্রথম প্রণিধানযোগ্য যে, প্রশ্নকারীরা কোন্ অর্থের দিক দিয়ে রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল? কোন কোন তফসীরবিদ বর্ণনার পূর্বাপর ধারার প্রতি লক্ষ্য করে প্রশ্নটি ওহী, কোরআন অথবা ওহী বাহক ফেরেশতা জিবরাঈল সম্পর্কে সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, এর পূর্বেও نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ এ কোরআনের উল্লেখ ছিল এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আবার কোরআনের উল্লেখ রয়েছে। এর সাথে মিল রেখে তারা বুঝেছেন যে, এ প্রশ্নেও রূহ্ বলে ওহী, কোরআন অথবা জিবরাঈলকেই বোঝানো হয়েছে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রতি ওহী কিভাবে আসে? কে আনে? কোরআন পাক এর উত্তরে শুধু এতটুকু বলেছে যে, আল্লাহ্র নির্দেশে ওহী আসে। ওহীর পূর্ণ বিবরণ ও অবস্থা বলা হয়নি।

কিন্তু যেসব সহীহ্ হাদীসে এ আয়াতের শানে-নুযূল বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোতে প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে, প্রশ্নকারীরা জৈব রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল এবং রূহের স্বরূপ অবগত হওয়াই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ রূহ্ কি? মানবদেহে রূহ্ কিভাবে আগমন করে? কিভাবে এর দ্বারা জীবজন্তু ও মানুষ জীবিত হয়ে যায়? সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেনঃ আমি একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মদীনার জনবসতিহীন এলাকায় পথ অতিক্রম করেছিলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে খর্জুর ডালের একটি ছড়ি ছিল। তিনি কয়েকজন

ইহুদীর কাছ দিয়ে গমন করছিলেন তারা পরস্পরে বলাবলি করছিল ঃ মুহাম্মদ (সা) আগমন করছেন। তাঁকে রূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। অপর কয়েকজনে নিষেধ করল। কিন্তু কয়েকজন ইহুদী প্রশ্ন করেই বসল। প্রশ্ন শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) ছড়িতে ভর দিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি অনুমান করলাম যে, তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হবে। কিছুক্ষণ পর ওহী নাযিল হলে তিনি এ আয়াত পাঠ করে শোনালেন ঃ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ বলা বাহুল্য কোরআন অথবা ওহীকে রূহ্ বলা কোরআনের একটি বিশেষ পরিভাষা ছিল। এখানে তাদের প্রশ্নকে এ অর্থে নেওয়া খুবই অবান্তর। তবে জৈব ও মানবীয় রূহের ব্যাপারটি এমন যে, এর প্রশ্ন প্রত্যেকের মনেই সৃষ্ট হয়ে থাকে। এজন্যই ইবনে কাসীর, ইবনে জারীর, কুরতুবী, বাহ্‌রে মুহীত, রূহুল মাআনী প্রমুখ সাধারণ তফসীরবিদরাই সাব্যস্ত করেছেন যে, জৈব রূহের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। বর্ণনার পূর্বাপর ধারায় কোরআনের আলোচনা এবং মাঝখানে রূহের প্রশ্নোত্তর বেখাপ্পা বলে প্রশ্ন করা হলে এর উত্তর এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফির ও মুশরিকদের বিরোধিতা এবং হঠকারিতাপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা এসেছে, যার উদ্দেশ্য ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালত পরীক্ষা করা। এ প্রশ্নটিও তারই একটি অংশ; কাজেই বেখাপ্পা নয়। বিশেষ করে শানে নুযূল সম্পর্কে অপর একটি সহীহ্ হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে যে, প্রশ্নকারীদের উদ্দেশ্য ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালত পরীক্ষা করা।

মসনদ আহমদের রিওয়ায়েত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ কোরাইশরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সঙ্গত অসঙ্গত প্রশ্ন করতো। একবার তারা মনে করল যে, ইহুদীরা বিদ্বান লোক। তারা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেরও জ্ঞান রাখে। কাজেই তাদের কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন করা দরকার; যেগুলো দ্বারা মুহাম্মদের পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। তদনুসারে কোরাইশরা কয়েকজন লোক ইহুদীদের কাছে প্রেরণ করল। তারা শিখিয়ে দিল যে, তোমরা তাঁকে রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। (ইবনে কাসীর) হযরত ইবনে (আব্বাস) (রা) থেকেই এক আয়াতের তফসীরে বর্ণিত রয়েছে যে, ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যে প্রশ্ন করেছিল, তাতে এ কথাও ছিল যে রূহ্‌কে কিভাবে আযাব দেওয়া হয়। তখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হয়নি বিধায় রসূলুল্লাহ্ (সা) তাৎক্ষণিক উত্তরদানে বিরত থাকেন। এরপর ফেরেশতা জিবরাঈল قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন।—(ইবনে কাসীর)

প্রশ্ন মক্কায় করা হয়েছিল, না মদীনায় ঃ শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাসের যে দু'টি হাদীস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে ইবনে মাসউদের হাদীস অনুযায়ী প্রশ্নটি মদীনায় করা হয়েছিল। এ কারণেই কোন কোন তসীরবিদ আয়াতটিকে 'মদনী' সাব্যস্ত করেছেন যদিও সূরা বনী ইসরাঈলর অধিকাংশই মক্কী।

পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত অনুসারে প্রশ্নটি মক্কায় করা হয়েছিল। এ দিক দিয়ে গোটা সূরার ন্যায় এ আয়াতটিও মক্কী। এ কারণেই ইবনে কাসীর এ সম্ভাবনা-কেই অগ্রাধিকার দিয়ে ইবনে মাসউদের হাদীসের উত্তরে বলেছেন যে, সম্ভবত এ আয়াতটি মদীনায় পুনর্বার নাযিল হয়েছে; যেমন কোরআনের অনেক আয়াতের পুনর্বার অবতরণ সবার কাছেই স্বীকৃত। তফসীর মাযহারী ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রশ্ন মদীনার এবং আয়তকে মদনী সাব্যস্ত করেছে। তফসীর মাযহারী এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছে। এক, এ রেওয়ায়েতটি বুখারী ও মুসলিমে বর্তমান। এর সনদ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতের সনদের চাইতে শক্তিশালী। দুই, এতে বর্ণনাকারী ইবনে মাসউদ স্বয়ং নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যত এটাই বোঝা যায় যে, তিনি বিষয়টি কারও কাছে শুনেছেন।

উল্লিখিত প্রশ্নের জওয়াব ঃ প্রশ্নের উত্তরে কুরআন বলেছে ঃ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي এই জওয়াবের ব্যাখ্যায় তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। তন্মধ্যে কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথীর উক্তিটিই সর্বাধিক বোধগম্য ও স্পষ্ট। তা এই যে, এ জওয়াবে যতটুকু বিষয় বলা জরুরী ছিল এবং যতটুকু বিষয় সাধারণ লোকের বোধগম্য ছিল, ততটুকুই বলে দেওয়া হয়েছে। রূহের সম্পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে যে প্রশ্ন ছিল জবাবে তা বলা হয়নি। কারণ, তা বোঝা সাধারণ লোকের সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল এবং তাদের কোন প্রয়োজন এটা বোঝার উপর নির্ভরশীলও ছিল না। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে উত্তরে বলে দিন ঃ রূহ্ আমার পালনকর্তার আদেশের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ রূহ্ সাধারণ সৃষ্টজীবের মতো উপাদানের সমন্বয়ে এবং জন্ম ও বংশ বিস্তারের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেনি; বরং তা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ كُنْ (হও) দ্বারা সৃজিত। এই জওয়াব একথা ফুটিয়ে তুলেছে যে, রূহ্কে সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করা যায় না। ফলে রূহ্কে সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করার ফলশ্রুতিতে যেসব সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সেগুলো দূর হয়ে গেল। রূহ্ সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান মানুষের জন্য যথেষ্ট। এর বেশি জ্ঞানের উপর তার কোন ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন আটকা নয়। তাই প্রশ্নের সেই অংশটিকে অনর্থক ও বাজে সাব্যস্ত করে জওয়াব দেওয়া হয়নি; বিশেষত যে ক্ষেত্রে এর স্বরূপ বোঝা সাধারণ লোকের তো কথাই নেই, বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতের পক্ষেও সহজ নয়।

প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া জরুরী নয়, প্রশ্নকারীর ধর্মীয় উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য ঃ ইমাম জাসসাস এই জওয়াব থেকে এ মাস'আলা বের করেছেন যে, প্রশ্নকারীর প্রত্যেক প্রশ্ন এবং তার দিকের জওয়াব দেওয়া মুফতী ও আলিমের দায়িত্বে জরুরী নয়; বরং তার ধর্মীয় উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে জওয়াব দেওয়া উচিত। যে জওয়াব প্রতিপক্ষের বোধশক্তির অতীত অথবা যে জওয়াবে প্রতিপক্ষের ভুল বোঝা-

বুঝিতে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে, সেই জওয়াব না দেওয়া উচিত। এমনিভাবে অনাবশ্যক ও বাজে প্রশ্নাদিরও জওয়াব দেওয়া উচিত নয়। তবে উপস্থিত ঘটনা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির যদি কোন আমল করা জরুরী হয়ে পড়ে এবং সে নিজে আলিম না হয়, তবে মুফতী ও আলিমের পক্ষে নিজ জ্ঞান অনুযায়ী এর জওয়াব দেওয়া জরুরী। (জাসসাস) ইমাম বুখারী 'ইলম' অধ্যায়ে এই মাস'আলার একটি স্বতন্ত্র শিরোনাম যুক্ত করে বলেছেন যে, যে প্রশ্নের জওয়াব দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে সেই প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া অনুচিত।

রূহের স্বরূপ সম্পর্কে কেউ জ্ঞান লাভ করতে পারে কি না? কোরআন পাক এ প্রশ্নের জওয়াব শ্রোতাদের প্রয়োজন ও বোধশক্তির অনুরূপ দান করেছে —রূহের স্বরূপ বর্ণনা করেনি। কিন্তু এতে জরুরী হয় না যে, রূহের স্বরূপ কোন মানুষ বুঝতেই পারে না স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা) ও এরূপ জানতেন না। সত্য এই যে, আলোচ্য আয়াতটি এর পক্ষেও নয় এবং বিপক্ষেও নয়। যদি কোন রসূল ওহীর মাধ্যমে এবং কোন ওলী কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে এর রূপ জেনে নেয়, তবে তা আয়াতের পরিপন্থী নয়। বরং যুক্তি দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিতেও এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তাকে অনর্থক ও বাজে বলা গেলেও অবৈধ বলা যায় না। এ জন্যই অনেক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিম রূহ্ সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। শেষ যুগে আমার উস্তাদ শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ) একখানি পুস্তিকায় এ প্রশ্নের উপর চমৎকার আলোকপাত করেছেন এবং রূহের স্বরূপ সাধারণ মানুষের পক্ষে যতটুকু বোঝা সম্ভব, ততটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন। একজন শিক্ষিত লোক এতে সন্তুষ্ট হতে পারে এবং সন্দেহ ও জটিলতা থেকে বাঁচতে পারে।

ফায়দা ঃ ইমাম বগভী এস্থলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। রেওয়ায়েতটি এই ঃ এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়। একবার মক্কায় কোরায়েশ সরদাররা একত্রিত হয়ে পরামর্শ করল যে, মুহাম্মদ (সা) আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততায় কেউ কোনদিন সন্দেহ করেনি। তিনি কোনদিন মিথ্যা বলেছেন বলেও কেউ অপবাদ আরোপ করেনি। এতদসত্ত্বেও তাঁর নবুয়তের দাবি আমাদের বোধগম্য নয়। তাই একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় ইহুদী আলিমদের কাছে প্রেরণ করে তার ব্যাপারে অনুসন্ধান করা দরকার। তদনুসারে তাদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনার ইহুদী আলিমদের কাছে পৌঁছল। ইহুদী আলিমরা তাদেরকে পরামর্শ দিল যে, আমরা তোমাদেরকে তিনটি বিষয় বলে দিচ্ছি। তোমরা এগুলো সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করবে। যদি তিনি তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর না দেন, তবে তিনি নবী নন। এমনিভাবে যদি একটি প্রশ্নেরও উত্তর না দেন, তবুও নবী নন। পক্ষান্তরে যদি দুটি প্রশ্নের উত্তর দেন এবং তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর না দেন, তবে বুঝে নেবে যে, তিনি নবী। প্রশ্ন তিনটি ছিল এই ঃ এক, তাঁকে ঐ লোকদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, যারা প্রাচীনকালে শিরক থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোন গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন। তাদের ঘটনা খুবই বিস্ময়কর। দুই ঐ ব্যক্তির অবস্থা

জিজ্ঞেস কর, যিনি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম সফর করেছিলেন। তার ঘটনা কি? তিন, রূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর।

প্রতিনিধি দলটি ফিরে এসে তিনটি প্রশ্নই রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে পেশ করে দিল। তিনি বললেনঃ আগামীকাল এর উত্তর দেব। কিন্তু তিনি 'ইনশাল্লাহ্' না বলায় এর ফলশ্রুতিতে কয়েকদিন পর্যন্ত ওহীর আগমন বন্ধ রইল। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এই বিরতিকাল বার থেকে শুরু করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বর্ণিত রয়েছে। কোরাইশরা বিদ্রূপ ও দোষারোপের সুযোগ পেয়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও উদ্বিগ্ন হলেন। এরপর হযরত জিবরাঈল এই আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেনঃ

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ —এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে কোন কাজের ওয়াদা করা হলে 'ইনশাল্লাহ্' বলে করতে হবে। এরপর রূহ্ সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। গর্তে আত্মগোপনকারীদের সম্পর্কে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা এবং পূর্ব পশ্চিমে সফরকারী যুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কেও আয়াত নাযিল হয়। পরবর্তী সূরা কাহ্ফে তা বর্ণিত হবে। ঐ সূরায় আসহাবে কাহ্ফ ও যুলকারনাইনের ঘটনা উত্তরে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে রূহের স্বরূপ সম্পর্কে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার জওয়াব দেওয়া হয়নি। (ফলে নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে ইহুদীদের বর্ণিত আলামত সত্যে পরিণত হয়।) তিরমিযীও এ রেওয়ায়েতটি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছে। (মাযহারী)

সূরা হিজরের ২৯ আয়াত وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ এর অধীনে রূহ্ নফস ইত্যাদির স্বরূপ সম্পর্কে তফসীর মাযহারীর বরাত দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাতে রূহের প্রকারভেদ ও প্রত্যেক প্রকারের স্বরূপ যথেষ্ট পরিমাণে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ ---পূর্ববর্তী আয়াতে রূহ্ সম্পর্কিত প্রশ্নের প্রয়োজন পরিমাণে উত্তর দিয়ে রূহের স্বরূপ আবিষ্কারের প্রয়াস থেকে একথা বলে নিবৃত্ত করা হয়েছিল যে, মানুষের জ্ঞান যত বেশিই হোক না কেন, বস্তুনিচয়ের সর্বব্যাপী স্বরূপের দিক দিয়ে তা অল্পই। তাই অনাবশ্যক আলোচনা ও খোঁজাখুঁজিতে লিপ্ত হওয়া মূল্যবান সময় নষ্ট করারই নামান্তর। وَلَئِنْ شِئْنَا আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে যতটুকুই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাও তার ব্যক্তিগত জায়গির নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাও ছিনিয়ে নিতে পারেন। কাজেই বর্তমান জ্ঞানের জন্য তার কৃতজ্ঞ থাকা এবং অনর্থক ও বাজে গবেষণায় সময় নষ্ট না করা উচিত; বিশেষত যখন উদ্দেশ্য গবেষণা করা নয়, বরং অপরকে পরীক্ষা করা ও লজ্জিত করাই উদ্দেশ্য

হয়। মানুষ যদি এরূপ করে, তবে এই বক্রতার পরিণতিতে তার অর্জিত জ্ঞানটুকু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। এ আয়াতে যদিও রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে উম্মতকে শোনানোই উদ্দেশ্য; অর্থাৎ রসূলের জ্ঞানও যখন তার ক্ষমতাধীন নয়, তখন অন্যের তো প্রশ্নই উঠে না।

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ — এ বিষয়বস্তুটি কোরআন পাকের কয়েকটি আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে। এতে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে সম্বোধন করে দাবি করা হয়েছে যে, যদি তোমরা কোরআনকে আল্লাহ্র কালাম স্বীকার না কর; বরং কোন মানব রচিত কালাম মনে কর, তবে তোমরা তো মানব; এর সমতুল্য কালাম রচনা করে তোমরা দেখিয়ে দাও। আয়াতে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, শুধু মানবই নয়, জিনদেরকেও সাথে মিলিয়ে নাও। অতঃপর সবাই মিলে কোরআনের একটি সূরা বরং একটি আয়াতের অনুরূপও রচনা করতে সক্ষম হবে না।

এ বিষয়বস্তুর এখানে পুনরাবৃত্তি সম্ভবত একারণে যে, তোমরা আমার রসূলকে নবুয়ত ও রিসালত পরীক্ষা করার জন্য রূহ্ ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন তাঁর প্রতি করে থাক। তোমরা কেন এসব অনর্থক কাজে ব্যাপৃত রয়েছ? স্বয়ং কোরআনকে দেখে নিলেই তাঁর নবুয়ত ও রিসালত সম্পর্কে কোন সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ থাকবে না। কেননা, সমগ্র বিশ্বের মানব ও জিন যখন তাঁর সামান্যতম দৃষ্টান্ত রচনা করতে সক্ষম নয়, তখন এটা যে আল্লাহ্র কালাম, তাতে কি সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে? কোরআনের আল্লাহ্র কালাম হওয়া যখন এভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত ও রিসালত সম্পর্কেও কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

সর্বশেষ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ---আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদিও কোরআনের মু'জিযা এতটুকু জাজ্বল্যমান যে, এরপর কোন প্রশ্ন ও সন্দেহের অবকাশ থাকে না; কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ লোক আল্লাহ্র নিয়ামতের শোকর করে না এবং কোরআনরূপী নিয়ামতকেও মূল্য দেয় না। তাই পথভ্রষ্টতায় উদভ্রান্ত হয়ে তারা ঘোরাফেরা করে।

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ﴿٩٠﴾ اَوْ تَكُوْنَ
لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ﴿٩١﴾ اَوْ
تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ
قَبِيْلًا ﴿٩٢﴾ اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ۭ وَلَنْ

تُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٣﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٤﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿٩٥﴾

(৯০) এবং তারা বলেঃ আমরা কখনও আপনাকে বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি ভূপৃষ্ঠ থেকে আমাদের জন্য একটি ঝরণা প্রবাহিত করে দিন, (৯১) অথবা আপনার জন্য খেজুরের ও আঙ্গুরের একটি বাগান হবে, অতঃপর আপনি তার মধ্যে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত করে দেবেন, (৯২) অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন, তেমনিভাবে আমাদের ওপর আসমানকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে দেবেন অথবা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন, (৯৩) অথবা আপনার কোন সোনার তৈরী গৃহ হবে অথবা আপনি আরোহণ করবেন এবং আমরা আপনার আকাশে আরোহণকে কখনও বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি অবতীর্ণ করেন আমাদের প্রতি এক গ্রন্থ, যা আমরা পাঠ করব। বলুনঃ পবিত্র মহান আমার পালন কর্তা, একজন মানব, একজন রসূল বৈ আমি কে? (৯৪) 'আল্লাহ কি মানুষকে পয়গম্বর করে পাঠিয়েছেন'? তাদের এই উক্তিই মানুষকে ঈমান আনয়ন থেকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে হিদায়ত। (৯৫) বলুনঃ যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করত, তবে আমি আকাশ থেকে কোন ফেরেশতাকেই তাদের নিকট পয়গম্বর করে প্রেরণ করতাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের কয়েকটি হঠকারিতাপূর্ণ প্রশ্ন ও আগাগোড়াহীন ফরমায়েশ এবং সেগুলোর জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে। (ইবনে জারীর)] তারা (কোরআনের অলৌকিকতার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত ও রিসালতের যথেষ্ট প্রমাণাদি পাওয়া সত্ত্বেও ঈমান আনে না এবং বাহানা করে) বলেঃ আমরা আপনার প্রতি কখনও বিশ্বাস স্থাপন করবো না, যে পর্যন্ত না আপনি আমাদের জন্য (মক্কার) ভূপৃষ্ঠ থেকে কোন ঝরণা প্রবাহিত করে দেন অথবা (বিশেষভাবে) আপনার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের কোন বাগান হয়ে যায়, অতঃপর বাগানের মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে অনেকগুলো নির্ঝরিণী আপনি প্রবাহিত করে দেন অথবা আপনার কথামত আপনি আসমানকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের ওপর ফেলে দেন [যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ

أَنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ (অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ভূগর্ভে পুতে দিতে পারি অথবা তাদের ওপর আসমান খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে দিতে পারি)] অথবা আপনি আল্লাহ্‌কে ও ফেরেশতাদেরকে (আমাদের) সামনে এনে দিন (যাতে আমরা খোলাখুলি দেখে নেই) অথবা আপনার কাছে কোন স্বর্ণনির্মিত গৃহ হবে অথবা আপনি (আমাদের সামনে) আকাশে আরোহণ করবেন এবং আমরা আপনার (আকাশে) আরোহণকে কখনও বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি (সেখান থেকে) আমাদের কাছে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসেন, যাকে আমরা পড়েও নেব (এবং তাতে যেন আপনার আকাশে আরোহণের সত্যতা স্বীকৃতিপত্ররূপে লেখা থাকে) (এসব প্রলাপোক্তির জওয়াবে) বলে দিন ঃ পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা, একজন প্রেরিত মানব বৈ আমি কে (যে, এসব ফরমায়েশ পূর্ণ করার সাধ্য আমার থাকবে? এ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই। মানবত্ব নিজ সত্তায় অপারগতা ও অক্ষমতার পরিচায়ক। আল্লাহ্‌র রসূল হলেও তাঁর প্রত্যেক বিষয়ের পরিপূর্ণ ক্ষমতা থাকতে পারে না। বরং রিসালতের জন্য এমন কোন প্রমাণ থাকাই যথেষ্ট, যা বুদ্ধিজীবীদের কাছে আপত্তিকর না হয়। সে প্রমাণ কোরআনের অলৌকিকতা ও অন্যান্য মু'জিযার আকারে বহুবার উপস্থিত করা হয়েছে। তাই রিসালতের জন্য এসব ফরমায়েশ সম্পূর্ণ নিরর্থক। হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলার সবকিছু করার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু তাঁর কাছে দাবি করার অধিকার কারও নেই। তিনি কোন বিষয়কে রহস্যের উপযুক্ত দেখলে তা প্রকাশও করে দেন। কিন্তু এতে তোমাদের সব ফরমায়েশ পূর্ণ করা জরুরী নয়।) যখন তাদের কাছে হিদায়ত (অর্থাৎ রিসালতের বিশুদ্ধ প্রমাণ; যেমন কোরআনের অলৌকিকতা) এসে গেছে, তখন তাদের বিশ্বাস স্থাপনে এছাড়া কোন (ভ্রূক্ষেপযোগ্য) বাধা নেই যে, তারা (মানবত্বকে রিসালতের পরিপন্থী মনে করে) বলেছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কি মানবকে পয়গম্বর করে প্রেরণ করেছেন? (অর্থাৎ এরূপ হতে পারে না।) আপনি (জওয়াবে আমার পক্ষ থেকে) বলে দিন ঃ যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে বিচরণ করত, তবে আমি অবশ্যই তাদের প্রতি আকাশ থেকে ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করতাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অসামঞ্জস্য প্রশ্নের পয়গম্বরসুলভ জওয়াব ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে যে সব প্রশ্ন ও ফরমায়েশ বিশ্বাস স্থাপনের শর্ত হিসাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে করা হয়েছে প্রত্যেক মানুষ এগুলোকে এক প্রকার ঠাট্টা এবং বিশ্বাস স্থাপন না করার বেহুদা বাহানা ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারে না। এ ধরনের প্রশ্নের জওয়াবে স্বভাবতই রাগের বশবর্তী হয়ে জওয়াব দেয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরকে যে জওয়াব শিক্ষা দিয়েছেন, তা প্রণিধানযোগ্য, সংস্কারকদের জন্য চির স্মরণীয় এবং কর্মের আদর্শ করার বিষয়। সবগুলো প্রশ্নের জওয়াবে তাদের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ

করা হয়নি এবং হঠকারিতাপূর্ণ দুষ্টামিও ফুটিয়ে তোলা হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রূপাত্মক বাক্যও উচ্চারণ করা হয়নি; বরং সাধাসিধা ভাষায় আসল স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, সম্ভবত তোমাদের ধারণা এই যে, আল্লাহ্‌র রসূলও সমগ্র খোদায়ী ক্ষমতার মালিক এবং সবকিছু করতে সক্ষম হওয়া উচিত। এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। রসূলের কাজ শুধু আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌঁছানো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রিসালত সপ্রমাণ করার জন্য অনেক মু'জিযাও প্রেরণ করেন। কিন্তু সেগুলো নিছক আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও ক্ষমতা দ্বারা হয়। রসূল খোদায়ী ক্ষমতা লাভ করেন না। তিনি একজন মানব, কাজেই মানবিক শক্তিবহির্ভূত নন। তবে যদি আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁর সাহায্যার্থে স্বীয় শক্তি প্রকাশ করেন, তবে তা ভিন্ন কথা।

মানবের রসূল মানবই হতে পারেন---ফেরেশতা মানবের রসূল হতে পারে না ঃ সাধারণ কাফির ও মুশরিকদের ধারণা ছিল, মানব আল্লাহ্‌র রসূল হতে পারে না। কেননা সে মানবীয় অভাব ও প্রয়োজনে অভ্যস্ত হয়। কাজেই সাধারণ মানুষের ওপর তার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই যে, তারা তাকে রসূল মনে করে অনুসরণ করবে। তাদের এ ধারণার জওয়াব কোরআন পাকে কয়েক জায়গায় বিভিন্ন শিরোনামে দেওয়া হয়েছে। এখানে مَا مَنَعَ النَّاسَ আয়াতে যে জওয়াব দেওয়া হয়েছে, তার সারমর্ম হলো যে, রসূলকে যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়, তাকে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। তারা মানব হলে রসূলেরও মানব হওয়া উচিত। কেননা, ভিন্ন শ্রেণীর সাথে পারস্পরিক মিল ব্যতীত হিদায়ত ও পথপ্রদর্শনের উপকার অর্জিত হয় না। ফেরেশতা ক্ষুধা-পিপাসা জানে না, কাম-প্রবৃত্তিরও জ্ঞান রাখে না এবং শীত-গ্রীষ্মের অনুভূতি ও পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি থেকেও মুক্ত। এমতাবস্থায় মানুষের প্রতি কোন ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করা হলে সে মানবের কাছেও উপরোক্তরূপ কর্ম আশা করতো এবং মানবের দুর্বলতা ও অক্ষমতা উপলব্ধি করতো না। এমনিভাবে মানব যখন বুঝত যে, সে ফেরেশতা, তার কাজকর্মের অনুকরণ করার যোগ্যতা মানুষের নেই, তখনই মানব তার অনুসরণ মোটেই করতো না। সংশোধন ও পথপ্রদর্শনের উপকার তখনই অর্জিত হতে পারে, যখন আল্লাহ্‌র রসূল মানব জাতির মধ্যে থেকে হয়। তিনি একদিকে মানবীয় ভাবাবেগ ও স্বভাবগত কামনা-বাসনার বাহকও হবেন এবং সাথে সাথে এক প্রকার ফেরেশতাসুলভ শানেরও অধিকারী হবেন---যাতে সাধারণ মানব ও ফেরেশতাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাছ থেকে ওহী বুঝে নিয়ে স্বজাতীয় মানবের কাছে পৌঁছাতে পারে।

উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা এ সন্দেহও দূর হয়ে গেল যে, মানুষ ফেরেশতার কাছ থেকে উপকার লাভে সক্ষম না হলে রসূল মানব হওয়া সত্ত্বেও ফেরেশতার কাছ থেকে ওহী কিরূপে লাভ করতে পারবে?

প্রশ্ন হয় যে, রসূল ও উম্মতের সমজাতি হওয়া যখন শর্ত, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) জিন জাতির রসূল নিযুক্ত হলেন কিরূপে? জিন তো মানবের সমজাতি নয়।

উত্তর এই যে, রসূল শুধু মানবই নন; বরং তিনি ফেরেশতাসুলভ ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদারও অধিকারী। এ কারণে তাঁর সাথে জিনদেরও সম্পর্ক থাকতে পারে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ তোমরা মানব হওয়া সত্ত্বেও দাবি কর যে, তোমাদের রসূল ফেরেশতা হওয়া উচিত। এ দাবি অযৌক্তিক। যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বসবাস করত এবং তাদের প্রতি রসূল প্রেরণ করার প্রয়োজন দেখা দিত, তবে ফেরেশতাকেই রসূল করা হত। এখানে পৃথিবীতে বসবাসকারী ফেরেশতাদের বিশেষণ يمشون مطمئنين উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে নিশ্চিন্তে বিচরণ করে। এ থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাদের প্রতি ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করার প্রয়োজন তখনই হত, যখন পৃথিবীর ফেরেশতারা স্বয়ং আকাশে যেতে না পারত; বরং পৃথিবীতেই বিচরণ করতে হত। পক্ষান্তরে যদি তারা স্বয়ং আকাশে যাওয়ার শক্তি রাখত, তবে পৃথিবীতে রসূল প্রেরণ করার প্রয়োজনই দেখা দিত না।

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا
بَصِيْرًا ۝ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ
اَوْلِيَاۗءَ مِنْ دُوْنِهٖ ۭ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰي وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا
وَّصُمًّا ۭ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ۝ ذٰلِكَ جَزَاۗؤُهُمْ
بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ
خَلْقًا جَدِيْدًا ۝ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
قَادِرٌ عَلٰٓي اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۭ فَاَبَى
الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ۝ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَاۗىِٕنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا
لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ۭ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ۝

(৯৬) বলুনঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠাকারী হিসাব আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। তিনি তো স্বীয় বান্দাদের বিষয়ে খবর রাখেন ও দেখেন। (৯৭) আল্লাহ্ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, সে'ই তো সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাদের জন্য আপনি আল্লাহ্ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পাবেন না। আমি কিয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মূক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে

আমি তখন তাদের জন্য অগ্নি আরও বৃদ্ধি করে দিব। (৯৮) এটাই তাদের শাস্তি, কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে এবং বলেছেঃ আমরা যখন অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব? (৯৯) তারা কি দেখেনি যে, যে আল্লাহ্ আসমান ও জমিন সৃজিত করেছেন, তিনি তাদের মত মানুষও পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম? তিনি তাদের জন্য স্থির করেছেন একটি নির্দিষ্ট কাল এতে কোন সন্দেহ নেই; অতঃপর জালিমরা অস্বীকার ছাড়া কিছু করেনি। (১০০) বলুনঃ যদি আমার পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার তোমাদের হাতে থাকত, তবে ব্যয়িত হয়ে যাওয়ার আশংকায় অবশ্যই তা ধরে রাখতে। মানুষ তো অতিশয় কৃপণ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যখন তারা রিসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার এবং যাবতীয় সন্দেহ দূর হয়ে যাওয়ার পরও বিশ্বাস স্থাপন করে না, তখন) আপনি (শেষ কথা) বলে দিনঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার ও তোমাদের মধ্যে (মতবিরোধের ব্যাপারে) যথেষ্ট সাক্ষী। (অর্থাৎ আল্লাহ্ জানেন যে, আমি বাস্তবিকই আল্লাহ্র রসূল; কেননা) তিনি স্বীয় বান্দাদের (অবস্থা)-কে ভালোভাবে জানেন, ভালোভাবে দেখেন (তোমাদের হঠকারীতাকেও দেখেন)। আল্লাহ্ যাকে পথে আনেন, সে-ই পথে আসে এবং যাকে পথভ্রষ্ট করে দেন, আপনি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন লোকদের সাহায্যকারী কাউকে পাবেন না। (কুফরের কারণে তারা আল্লাহ্র সাহায্য থেকে বঞ্চিত। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য না হলে হিদায়তও হতে পারে না এবং আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারে না।) আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে অন্ধ, বধির ও মূক করে মুখে ভর করে চালিত করব। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। (এর অবস্থা এই যে) তা (অর্থাৎ জাহান্নামের অগ্নি) যখনই নিষ্প্রভ হতে থাকবে, তখনই আমি তাদের জন্য আরও প্রজ্জ্বলিত করে দেব। এটা তাদের শাস্তি, একারণে যে, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং বলেছিলঃ আমরা যখন অস্থি এবং (তাও) চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তখনও কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হয়ে (কবর থেকে) উত্থিত হব? তাদের কি এতটুকু জানা নেই যে, যে আল্লাহ্ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, তিনি (আরও উত্তমরূপে) তাদের মত মানুষ পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম? এবং (অবিশ্বাসীরা সম্ভবত মনে করে যে, হাজারো লাখো মানুষ মরে গেছে; কিন্তু পুনরুজ্জীবনের ওয়াদা আজ পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি। শোন, এর কারণ এই যে) তাদের। (পুনরুজ্জীবনের) জন্য তিনি একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, এতে (অর্থাৎ এ সময়ের আগমনে) বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। এতদসত্ত্বেও জালিমরা অস্বীকার না করে থাকে নি। আপনি বলে দিনঃ যদি আমার পালনকর্তার রহমতের (অর্থাৎ নবুয়তের) ভাণ্ডার (অর্থাৎ গুণাবলী) তোমাদের হাতে থাকত (অর্থাৎ যাকে ইচ্ছা দিতে, যাকে ইচ্ছা না দিতে) তবে তোমরা ব্যয়িত হয়ে যাওয়ার আশংকায় অবশ্যই তা বন্ধ করে রাখতে (কখনো কাউকে দিতে না; অথচ এটা কাউকে দিলে হ্রাসও

পায় না।) মানুষ বড়ই ছোট মন। (ক্ষয় পায় না—এমন বস্তুও সে দান করতে দ্বিধাবোধ করে। এর কারণ পয়গম্বরদের সাথে শত্রুতা এবং কৃপণতা ছাড়া সম্ভবত এটাও যে, কাউকে নবী করলে তার নির্দেশাবলী পালন করতে হবে; যেমন কোন জাতি পারস্পরিক ঐকমত্যে কাউকে বাদশাহ মনোনীত করলে যদিও তারাই মনোনীত করে থাকে; কিন্তু মনোনীত হয়ে যাওয়ার পর তার আদেশই সবাইকে পালন করতে হয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছেঃ যদি তোমরা আল্লাহ্‌র রহমতের ভাণ্ডারের মালিক হয়ে যাও, তবে তাতেও কৃপণতা করবে। কাউকে দেবে না এ আশংকায় যে, এভাবে দিতে থাকলে ভাণ্ডারই নিঃশেষ হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহ্‌র রহমতের ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হয় না। কিন্তু মানুষ স্বভাবগতভাবে ছোটমনা ও কম সাহসী। অকাতরে দান করার সাহস তার নেই।

এখানে সাধারণ তফসীরবিদগণ 'পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার' শব্দের অর্থ নিয়েছেন ধনভাণ্ডার। পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, মক্কার কাফিররা ফরমায়েশ করেছিল, যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য নবী হন, তবে মক্কার শুষ্ক মরুভূমিতে নদী-নালা প্রবাহিত করে একে সিরিয়ার মত সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা করে দিন। এর জওয়াবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা যেন আমাকে খোদাই মনে করে নিয়েছ। ফলে আমার কাছ থেকে খোদায়ী ক্ষমতা দাবী করছ। আমি তো একজন রসূল মাত্র। খোদা নই যে, তোমরা যা চাইবে, তাই করব। আলোচ্য আয়াতকে যদি এর সাথেই সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, মক্কার মরুভূমিকে নদী-নালা বিধৌত শস্য শ্যামলা প্রান্তরে পরিণত করার ফরমায়েশ যদি আমার রিসালত পরীক্ষা করার জন্য হয়, তবে এর জন্য কোরআনের অলৌকিকতার মু'জিযাটি যথেষ্ট। অন্য ফরমায়েশের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে যদি জাতীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য হয়, তবে স্মরণ রেখ, যদি তোমাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী মক্কার ভূখণ্ডে তোমাদেরকে সবকিছু দেওয়াও হয় এবং ধন-ভাণ্ডারের মালিক তোমাদেরকে করে দেওয়া হয়, তবে এর পরিণামও জাতীয় ও জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হবে না; বরং মানবীয় অভ্যাস অনুযায়ী যার হাতে এই ধন-ভাণ্ডার থাকবে, সে সর্প হয়ে তার উপর বসে যাবে, জনগণের কল্যাণার্থে ব্যয় করতে চাইবে না দারিদ্রের আশংকা করবে। এমতাবস্থায় মক্কার গুটি-কতক বিত্তশালীর আরও বিত্তশালী ও সুখী হওয়া ছাড়া জনগণের কি উপকার হবে? অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই সাব্যস্ত করেছেন।

কিন্তু হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র) বয়ানুল কোরআনকে এখানে রহমতের অর্থ নবুয়ত ও রিসালত এবং ভাণ্ডারের অর্থ নবুয়তের উৎকর্ষ নিয়েছেন। এ তফসীর অনুযায়ী পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক এই যে, তোমরা আমার নবুয়ত ও রিসালতের জন্য যেসব আগাগোড়াহীন অনর্থক দাবি করছ, সেগুলোর সারমর্ম এই যে, তোমরা আমার নবুয়ত স্বীকার করতে চাও না। অতঃপর তোমরা কি চাও যে, নবুয়তের

ব্যবস্থাপনা তোমাদের হাতে অর্পণ করা হোক, যাতে তোমরা যাকে ইচ্ছা নবী করে দাও। এরূপ করা হলে এর পরিণতি হবে এই যে, তোমরা কাউকে নবুয়ত দেবে না—কৃপণ হয়ে বসে থাকবে। হযরত থানভী (র) এই তফসীর লিপিবদ্ধ করে বলেছেন যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম দান। তফসীরটি খুবই স্থানোপযোগী। এ স্থলে নবুয়তকে রহমত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা এমন, যেমন أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ আয়াতে সর্বস্বীকৃত মতে রহমত শব্দের অর্থ নবুয়ত و الله سبحانه و تعالى اعلم

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ
لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ
هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ
مَثْبُوْرًا ﴿١٠٢﴾ فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ﴿١٠٣﴾
وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ
جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ﴿١٠٤﴾ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا
وَّنَذِيْرًا ﴿١٠٥﴾ وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ
تَنْزِيْلًا ﴿١٠٦﴾ قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ
اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ
اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَ
يَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿١٠٩﴾

(১০১) আপনি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করুন, আমি মূসাকে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দান করেছি। যখন তিনি তাদের কাছে আগমন করেন, ফিরাউন তাকে বলল ঃ হে মূসা, আমার ধারণায় তুমি তো যাদুগ্রস্ত। (১০২) তিনি বললেন ঃ তুমি জান যে আসমান ও জমিনের পালনকর্তাই এ সব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেছেন। হে ফিরাউন, আমার ধারণায় তুমি ধ্বংস হতে চলেছ। (১০৩) অতঃপর সে

বনী ইসরাঈলকে দেশ থেকে উৎখাত করতে চাইল, তখন আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের সবাইকে নিমজ্জিত করে দিলাম। (১০৪) তারপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম ঃ এদেশে তোমরা বসবাস কর। অতঃপর যখন পরকালের ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে, তখন তোমাদেরকে জড়ো করে নিয়ে উপস্থিত হব। (১০৫) আমি সত্যসহ এ কোরআন নাযিল করেছি এবং সত্যসহ এটা নাযিল হয়েছে। আমি তো আপনাকে শুধু সুসংবাদ-দাতা ও ভয় প্রদর্শক করেই প্রেরণ করেছি। (১০৬) আমি কোরআনকে যতিচিহ্নসহ পৃথক পৃথকভাবে পাঠের উপযোগী করেছি, যাতে আপনি একে লোকদের কাছে ধীরে ধীরে পাঠ করেন এবং আমি একে যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। (১০৭) বলুন ঃ তোমরা কোরআনকে মান্য কর অথবা অমান্য কর; যারা এর পূর্ব থেকে ইল্‌মপ্রাপ্ত হয়েছে, যখন তাদের কাছে এর তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা নত মস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে (১০৮) এবং বলে ঃ আমাদের পালনকর্তা পবিত্র মহান। নিঃসন্দেহে আমাদের পালনকর্তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। (১০৯) তারা ক্রন্দন করতে করতে নত মস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি পায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি মূসা (আ)-কে নয়টি প্রকাশ্য মু'জিযা দান করেছি (এগুলো নবম পারার ষষ্ঠ রুকূর প্রথম আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।) যখন তিনি বনী ইসরাঈলের কাছে এসেছিলেন। অতএব আপনি বনী ইসরাঈলকে (ও ইচ্ছা করলে) জিজ্ঞেস করে দেখুন। [যেহেতু মূসা (আ) ফিরাউনের প্রতিও প্রেরিত হয়েছিলেন এবং ফিরাউন ও ফিরাউন বংশীয়দের ঈমান না আনার কারণে মু'জিযাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল, তাই মূসা (আ) ফিরাউনকে পুনরায় ঈমান আনার জন্য হুঁশিয়ার করেন এবং মু'জিযার মাধ্যমে ভয় প্রদর্শন করেন।] ফিরাউন বলল ঃ হে মূসা, আমার ধারণায় অবশ্যই তোমার উপর কেউ যাদু করেছে, (যদ্দরুন তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে এবং তুমি আবোল-তাবোল কথাবার্তা বলছ।) মূসা (আ) বললেন ঃ তুমি (মনে মনে) জান (যদিও লজ্জার কারণে মুখে স্বীকার কর না।) যে, এগুলো আসমান ও জমিনের পালনকর্তাই নাযিল করেছেন এমতাবস্থায় যে, এগুলো জ্ঞানের জন্য (যথেষ্ট) উপায়। আমার ধারণায় হে ফিরাউন, তোমার দুর্ভাগ্যের দিন ঘনিয়ে এসেছে। [এক সময় ফিরাউনের অবস্থা ছিল এই যে, মূসা (আ)-র অনুরোধ সত্ত্বেও সে বনী ইসরাঈলকে মিসর ত্যাগের অনুমতি দিত না এবং] অতঃপর (অবস্থা এই হয়েছে যে) সে [মূসা (আ)-র প্রভাবে বনী ইসরাঈলের শক্তিশালী হয়ে যাওয়ার আশংকায় নিজেই] বনী ইসরাঈলকে দেশ থেকে উৎখাত করতে চাইল (অর্থাৎ তাদেরকে দেশান্তরিত করতে চাইল।) অতঃপর আমি (তার সফল হওয়ার পূর্বেই স্বয়ং) তাকে ও তার সঙ্গী সবাইকে নিমজ্জিত করে দিলাম এবং তাঁর (অর্থাৎ তাকে নিমজ্জিত করার) পর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম ঃ (এখন) এদেশে (-র যে স্থান থেকে তোমাদেরকে উৎখাত করতে চেয়েছিল, সে স্থানের মালিক তোমরাই। কাজেই এতে) বসবাস কর (প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে; কিন্তু

এই মালিকানা পার্থিব জীবন পর্যন্ত)। অতঃপর যখন পরকালের ওয়াদা আসবে, তখন আমি সবাইকে জড়ো করে (কিয়ামতের ময়দানে গোলামের মতো) নিয়ে আসব। (প্রথমে এরূপ হবে। এরপর মু'মিন ও কাফির এবং সৎ ও অসৎকে আলাদা করে দেওয়া হবে। আমি মূসাকে যেমন মু'জিযা দিয়েছি, তেমনি আপনাকেও অনেক মু'জিযা দান করেছি। তন্মধ্যে একটি বিরাট মু'জিযা হচ্ছে কোরআন।) আমি এ কোরআনকে সত্যসহ নাযিল করেছি এবং তা সত্যসহই (আপনার প্রতি) নাযিল হয়েছে। (অর্থাৎ প্রেরকের কাছ থেকে যেমনটি রওয়ানা হয়েছিল, প্রাপকের কাছে তেমনটিই পৌঁছেছে। মাঝখানে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও হস্তক্ষেপ হয়নি। অতএব আগাগোড়া সবই সত্য।) এবং [আমি যেমন মূসা (আ)-কে পয়গম্বর করেছিলাম এবং হিদায়ত তাঁর ক্ষমতাধীন ছিল না, তেমনি] আমি আপনাকে (ও) শুধু (ঈমানের সওয়াবের) সুসংবাদদাতা এবং (কুফরের আযাবের) ভয় প্রদর্শন করে প্রেরণ করেছি (কেউ ঈমান না আনলে কোন চিন্তা করবেন না)। এবং কোরআনে (সত্যের সাথে সাথে রহমতের তাগিদ অনুযায়ী আরও এমন গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যেগুলো দ্বারা হিদায়তে অধিক সহজ হয়। এক এই যে,) আমি (আয়াত ইত্যাদির) স্থানে স্থানে প্রভেদ রেখেছি, যাতে আপনি থেমে থেমে পাঠ করেন। (এভাবে তারা ভালরূপে বুঝতে পারবে। কেননা, উপর্যুপরি দীর্ঘ বক্তব্য মাঝে মাঝে আয়ত্ত করা যায় না।) এবং (দ্বিতীয় এই যে) আমি নাযিলও (ঘটনাবলী অনুযায়ী) ক্রমান্বয়ে করেছি (যাতে অর্থ চমৎকাররূপে ফুটে উঠে। এসব বিষয়ের তাগিদ অনুযায়ী তাদের বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত ছিল। কিন্তু এর পরও বিশ্বাস স্থাপন না করলে আপনি পরওয়া করবেন না; বরং) আপনি (পরিষ্কার) বলে দিনঃ তোমরা কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর অথবা করো না, (আমার কোন পরওয়া নেই দু'কারণে। এক এতে আমার কি ক্ষতি? দুই. তোমরা বিশ্বাস স্থাপন না করলে কি হবে, অন্য লোকেরা বিশ্বাস স্থাপন করবে। সেমতে) যাদেরকে কোরআনের (অর্থাৎ কোরআন নাযিল হওয়ার) পূর্বে (ধর্মের) ইল্‌ম দেওয়া হয়েছিল (অর্থাৎ গ্রন্থধারী সম্প্রদায়ের সত্যপন্থী আলিম), তাদের সামনে যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন নতথুতনি সিজদায় পড়ে যায় এবং বলেঃ আমাদের পালনকর্তা (ওয়াদার খেলাপ করা থেকে) পবিত্র। নিশ্চয় আমাদের পালনকর্তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হয়। (সেমতে তিনি যে নবীর প্রতি যে কিতাব নাযিল করার ওয়াদা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে করেছিলেন, তা পূর্ণ করেছেন।) এবং নতথুতনি লুটিয়ে পড়ে ক্রন্দন করতে করতে। এই কোরআন (অর্থাৎ কোরআন পাঠ শোনা) তাদের (অন্তরের) বিনয়ভাব আরও বাড়িয়ে দেয়। (কেননা, বাহ্যিক অবস্থা ও আন্তরিক অবস্থার মিল বিনয়ভাবকে শক্তিশালী করে দেয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ ——এতে মূসা (আ)-কে নয়টি প্রকাশ্য

নিদর্শন দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। اٰيٰتٍ শব্দটি মু'জিযা এবং কোরআনী আয়াতের অর্থাৎ আহ্কামে ইলাহীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে। একদল তফসীরবিদ এখানে اٰيٰتٍ এর অর্থ মু'জিযা নিয়েছেন। নয় সংখ্যা উল্লেখ করায় নয়ের বেশি না হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু এখানে বিশেষ গুরুত্বের কারণে নয় উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস নয়টি মু'জিযা এভাবে গণনা করেছেন ঃ ১. মূসা (আ)-এর লাঠি, যা অজগর সাপ হয়ে যেত, ২. শুভ্র হাত, যা জামার নিচ থেকে বের করতেই চমকাতে থাকত, ৩. মুখের তোৎলামি---যা দূর করে দেওয়া হয়েছিল, ৪. বনী ইসরাঈলকে নদী পার করার জন্য নদীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রাস্তা করে দেওয়া, ৫. অস্বাভাবিকভাবে পঙ্গপালের আযাব প্রেরণ করা, ৬. তূফান প্রেরণ করা, ৭. শরীরের কাপড়ে এত উকুন সৃষ্টি করা, যা থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় ছিল না, (৮) ব্যাঙের আযাব চাপিয়ে দেওয়া, ফলে প্রত্যেক পানাহারের বস্তুতে ব্যাঙ কিলবিল করত এবং ৯. রক্তের আযাব প্রেরণ করা। ফলে প্রত্যেক পাত্রে ও পানাহারের বস্তুতে রক্ত দেখা যেত।

অপর একটি সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় যে, এখানে اٰيٰتٍ বলে আল্লাহ্র বিধি-বিধান বোঝানো হয়েছে। এই হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বিশুদ্ধ সনদ সহকারে সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ জনৈক ইহুদী তার সঙ্গীকে বলল ঃ আমাকে এই নবীর কাছে নিয়ে চল। সঙ্গী বলল ঃ নবী বলো না। সে যদি জানতে পারে যে, আমরাও তাকে নবী বলি, তবে তার চার চক্ষু গজাবে। অর্থাৎ সে গর্বিত ও আনন্দিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। অতঃপর তারা উভয়েই রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ মূসা (আ) যে নয়টি প্রকাশ্য আয়াত প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেগুলো কি কি? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ১. আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না, ২. চুরি করো না, ৩. যিনা করো না, ৪. যে প্রাণকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন, তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না, ৫. কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে মিথ্যা দোষারোপ করে হত্যা ও শাস্তির জন্য পেশ করো না, ৬. যাদু করো না, ৭. সুদ খেয়ো না, ৮. সতীসাধ্বী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করো না, ৯. জিহাদের ময়দান থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে পলায়ন করো না। হে ইহুদী সম্প্রদায়, বিশেষ করে তোমাদের জন্য এ বিধানও আছে যে, শনিবার সম্পর্কে যেসব বিধান তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো ভঙ্গ করো না।

এসব কথা শুনে উভয় ইহুদী রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হস্তপদ চুম্বন করে বলল ঃ আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহ্র রসূল। তিনি বললেন ঃ তাহলে আমাকে অনুসরণ করতে তোমাদের বাধা কি? তারা বলল ঃ হযরত দাউদ (আ) স্বীয় পালনকর্তার কাছে দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর বংশধরের মধ্যে যেন সব সময় নবী জন্মগ্রহণ

করে। আমাদের আশংকা, যদি আমরা আপনাকে অনুসরণ করি, তাহলে ইহুদীরা আমাদেরকে বধ করবে।

এই তফসীরটি সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই অনেক তফসীরবিদ একেই অগ্রগণ্যতা দান করেছেন।

يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ---তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ কোরআন তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা মুস্তাহাব। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করে, সে জাহান্নামে যাবে না, যে পর্যন্ত না দোহন করা দুধ পুনর্বার স্তনে ফিরে আসে। (অর্থাৎ দোহন করা দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনিভাবে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়াও অসম্ভব।) অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা দু'টি চক্ষুর উপর জাহান্নামের অগ্নি হারাম করেছেন। এক, যে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করে। দুই, যে ইসলামী সীমান্তের হিফাযতে রাত্রিকালে জাগ্রত থাকে। (বায়হাকী, হাকিম) হযরত নযর ইবনে সা'দ বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে সম্প্রদায়ে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারী রয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সেই সম্প্রদায়কে তার কারণে অগ্নি থেকে মুক্তি দেবেন।---(রূহুল মা'আনী)

আজ মুসলমান জাতি যে মহাবিপদে পতিত আছে, এর কারণ এটাই যে, তাদের মধ্যে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারীর সংখ্যা খুবই কম। রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার এস্থলে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনের ফযীলত সম্পর্কিত অনেক হাদীস উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ وينبغي ان يكون ذالك حال العلماء অর্থাৎ আলিমদের এরূপ অবস্থাই হওয়া উচিত। কেননা, ইবনে জরীর, ইবনে মুন্যির প্রমুখ তফসীরবিদ আবদুল আ'লা তায়মী (রহ)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, যে ব্যক্তি শুধু এমন ইল্ম প্রাপ্ত হয়েছে, যা তাকে ক্রন্দন করায় না; বুঝে নাও যে, সে উপকারী ইল্ম প্রাপ্ত হয়নি।

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ
وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي
الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

(১১০) বলুন ঃ আল্লাহ্ বলে আহ্বান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহ্বান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই। আপনি নিজের নামায আদায়কালে স্বর

উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়ে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যম পন্থা অবলম্বন করুন। (১১১) বলুনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি না কোন সন্তান রাখেন, না তার সার্বভৌমত্বে কোন শরীক আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে থাকুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলে দিনঃ তোমরা 'আল্লাহ্' নামে আহবান কর অথবা 'রহমান' নামে আহবান কর, যে নামেই আহবান কর না কেন (তাই ভালো, কারণ) তাঁর জন্য রয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর নাম। (এবং এর সাথে অংশীবাদীতার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ একই সত্তার একাধিক নাম হওয়ার ফলে তাঁর একত্ববাদের মধ্যে কোন হেরফের হয় না।) এবং আপনি নিজ নামায আদায়কালে স্বর উচ্চগ্রামেও নিয়ে যাবেন না (যে, অংশীবাদিরা শুনবে এবং যথেচ্ছ বাজে কথা বলবে, ফলে নামায আদায়রত চিত্ত মনোযোগছিন্ন হয়ে পড়বে) এবং অতিশয় ক্ষীণভাবেও পড়বেন না (যে, মুক্তাদী নামাযীদেরও শ্রুতিগোচর হবে না। কারণ, তা'হলে তাদের শিক্ষাদীক্ষায় অপূর্ণাঙ্গতা এসে যাবে।) এবং এ দুইয়ের মধ্যবর্তী একটি (মধ্য) পন্থা অবলম্বন করুন (যাতে করে যথোপযোগিতা ব্যাহত না হয় এবং অবাঞ্ছিত পরিবেশ মুকাবিলা করতে না হয়)। আর (কাফিরদের বক্তব্য খণ্ডনের জন্য প্রকাশ্য ঘোষণায়) বলে দিনঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্যে (বিশেষভাবে নির্ধারিত), যিনি না কোন সন্তান গ্রহণ করেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্তও হন না, যে কারণে তাঁর সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এগুলো সূরা বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ আয়াত। এ সূরার প্রারম্ভেও আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও তওহীদের বর্ণনা ছিল এবং সর্বশেষ আয়াতগুলোতেও এ বিষয়বস্তুই বিধৃত হয়েছে। কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এক, রসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন দোয়ায় 'ইয়া আল্লাহ্' ইয়া রহমান বলে আহ্বান করলে মুশরিকরা মনে করতে থাকে যে, তিনি দু' আল্লাহ্‌কে আহ্বান করেন। তারা বলাবলি করতে থাকে যে, আমাদেরকে তো একজন ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকতে নিষেধ করেন অথচ নিজেই দু' উপাস্যকে ডাকেন। আয়াতের প্রথম অংশে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার দু'টিই নয়, আরও অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে। যে নামেই ডাকা হবে, উদ্দেশ্য একই সত্তা। কাজেই তোমাদের জল্পনা-কল্পনা ভ্রান্ত।

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, মক্কায় রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন নামাযে উচ্চ স্বরে তিলাওয়াত করতেন, তখন মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং কোরআন, জিবরাঈল ও স্বয়ং আল্লাহ্

তা'আলাকে উদ্দেশ্য করে ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা বলত। এর জওয়াবে আয়াতের শেষাংশ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সশব্দ ও নিঃশব্দ উভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কেননা মধ্যবর্তী শব্দে পাঠ করলেই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায় এবং সশব্দে পাঠ করলে মুশরিকরা নিপীড়নের যে সুযোগ পেত, তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

তৃতীয় ঘটনা এই যে, ইহুদী ও খৃস্টানরা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করত। আরবরা প্রতিমাদেরকে আল্লাহ্র শরীক বলত। সাবেয়ী ও অগ্নিপূজারিরা বলত যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যশীল কেউ না থাকলে তাঁর সম্মান ও মহত্ত্ব লাঘব হয়। এ দলত্রয়ের জওয়াবে সর্বশেষ আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে তিনটি বিষয়েরই খণ্ডন করা হয়েছে।

দুনিয়াতে সৃষ্টজীব যা দ্বারা শক্তিলাভ করে সে কোন সময় নিজের চাইতে ছোট হয়---যেমন সন্তান; কোন সময় নিজের সমতুল্য হয়; যেমন অংশীদার এবং কোন সময় নিজের চাইতে বড় হয়; যেমন সমর্থক ও সাহায্যকারী। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য যথাক্রমে তিনটিই নাকচ করে দিয়েছেন।

মাস'আলা ঃ উল্লিখিত আয়াতে নামাযে কোরআন তিলাওয়াতের আদব বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, খুবই উচ্চ স্বরে না হওয়া চাই এবং এমন নিঃশব্দেও না হওয়া চাই যে, মুক্তাদীরা শুনতে পায় না। বলা বাহুল্য এ বিধান বিশেষ করে 'জেহরী' (সশব্দে পঠিত) নামাযসমূহের জন্য। যোহর ও আসরের নামাযে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে পাঠ করা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

'জেহরী' নামায বলতে ফজর, মাগরিব ও এশার নামায বুঝায়। তাহাজ্জুদের নামাযও এর অন্তর্ভুক্ত; যেমন এক হাদীসে রয়েছে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাজ্জুদের সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর ফারুক (রা)-এর কাছ দিয়ে গেলে হযরত আবূ বকরকে নিঃশব্দে এবং হযরত উমরকে উচ্চস্বরে তিলাওয়াতরত দেখতে পান। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে বললেন ঃ আপনি এত নিঃশব্দ তিলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরয করলেন ঃ যাকে শোনানো উদ্দেশ্য তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা গোপনতম আওয়াজও শ্রবণ করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সামান্য শব্দ সহকারে পাঠ করুন। অতঃপর হযরত উমরকে বললেন ঃ আপনি এত উচ্চ স্বরে তিলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরয করলেন ঃ আমি নিদ্রা ও শয়তানকে বিতাড়িত করে দেওয়ার জন্য উচ্চস্বরে পাঠ করি। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকেও আদেশ দিলেন যে, অনুচ্চ শব্দে পাঠ করুন।---(তিরমিযী)

নামাযের ভেতরে ও বাইরে সশব্দে ও নিঃশব্দে কোরআন তিলাওয়াত সম্পর্কিত মাস'আলা সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষ আয়াত قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, এটি ইযামতের আয়াত। (আহমদ তাবরানী) এ আয়াতে এরূপ

নির্দেশও আছে যে, মানুষ যতই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও তসবীহ পাঠ করুক, নিজের আমলকে কম মনে করা এবং ত্রুটি স্বীকার করা তার জন্য অপরিহার্য। (মাযহারী)

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আবদুল মুত্তালিবের পরিবারে যখন কোন শিশু কথা বলার যোগ্য হয়ে যেত, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে এ আয়াত শিখিয়ে দিতেন ঃ

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ یَكُنْ لَّهٗ شَرِیْكٌ فِی الْمُلْكِ وَلَمْ یَكُنْ لَّهٗ وَلِیٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِیْرًا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন ঃ একদিন আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বাইরে গেলাম। তখন আমার হাত তাঁর হাতে অবদ্ধ ছিল। তিনি জনৈক দুর্দশাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন ব্যক্তির কাছে দিয়ে গমন করার সময় তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার এই দুদর্শা কেন? লোকটি আরয করল ঃ রোগব্যাধি ও দারিদ্র্যের কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য বলে দিই। এগুলো পাঠ করলে তোমার রোগব্যাধি ও অভাব-অনটন দূর হয়ে যাবে। বাক্যগুলো এই ঃ تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَمُوْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا الایۃ এর কিছু দিন পর রসূলুল্লাহ্ (সা) আবার সে দিকে গমন করলে লোকটিকে সুখী দেখতে পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। সে আরয করল ঃ যেদিন আপনি আমাকে বাক্যগুলো বলে দেন, সেদিন থেকে নিয়মিতই সেগুলো পাঠ করি।---(মাযহারী)

سورة الكهف

সূরা কাহ্‌ফ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ১১০ আয়াত ঃ ১২ রুকূ

সূরা কাহ্‌ফের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত ঃ মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও মসনদ আহমদে হযরত আবুদ্দারদা থেকে একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে হযরত আবুদ্দারদা থেকেই অপর একটি রিওয়ায়েতে এই বিষয়বস্তু সূরা কাহ্‌ফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ করা সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে।

মসনদে আহমদে হযরত সাহ্‌ল ইবনে মু'আযের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম ও শেষ আয়াতগুলো পাঠ করে, তার জন্য তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটি নূর হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সূরা পাঠ করে, তার জন্য জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত নূর হয়ে যায়।

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন সূরা কাহ্‌ফ তিলাওয়াত করে, তার পা থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর হয়ে যাবে, যা কিয়ামতের দিন আলো দেবে এবং বিগত জুম'আ থেকে এই জুম'আ পর্যন্ত তার সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।---(ইমাম ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েতটিকে মওকুফ বলেছেন।)

হাফেয জিয়া মুকাদ্দাসী 'মুখতারাহ্' গ্রন্থে হযরত আলী (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহ্‌ফ পাঠ করবে, সে আট দিন পর্যন্ত সর্বপ্রকার ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে। যদি দাজ্জাল বের হয়, তবে সে তার ফিতনা থেকেও মুক্ত থাকবে।---(এসব রেওয়ায়েত ইবনে-কাসীর থেকে গৃহীত।)

রূহুল-মা'আনীতে হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণিত রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সূরা কাহ্‌ফ সম্পূর্ণটুকু এক সময়ে নাযিল হয়েছে এবং সত্তর হাজার ফিরিশতা এর সঙ্গে আগমন করেছেন। এতে এর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়।

শানে নুযূল ঃ ইমাম ইবনে জারীর তাবারী হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন ঃ যখন মক্কায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়তের চর্চা শুরু হয় এবং কোরায়শরা তাতে বিব্রত বোধ করতে থাকে, তখন তারা নযর ইবনে হারিস ও ওকবা ইবনে আবী মুয়ীতকে মদীনার ইহুদী আলিমদের কাছে প্রেরণ করে। তারা পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জীলের পণ্ডিত ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে তারা কি বলে, একথা জানার জন্য এই প্রতিনিধি দল প্রেরিত হয়েছিল। ইহুদী আলিমরা তাদেরকে বলে দেয় যে, তোমরা তাঁকে তিনটি প্রশ্ন কর। তিনি এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলে বুঝে নাও যে, তিনি

আল্লাহ্র রসূল। অন্যথায় বুঝতে হবে যে, তিনি একজন বাগাড়ম্বরকারী---রসূল নন। এক, তাঁকে ঐসব যুবকের অবস্থা জিজ্ঞেস কর, যারা প্রাচীনকালে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তাদের ঘটনা কি? কেননা, এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা। দুই, তাঁকে সে ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস কর, যে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম এবং সারা বিশ্ব সফর করেছিল। তার ঘটনা কি? তিন, তাঁকে রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন কর যে, এটা কি?

উভয় কোরায়শী মক্কায় ফিরে এসে ভ্রাতৃসমাজকে বলল ঃ আমরা একটি চূড়ান্ত ফয়সালার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফিরে এসেছি। অতঃপর তারা তাদেরকে ইহুদী আলিমদের কাহিনী শুনিয়ে দিল। কোরায়শরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এ প্রশ্নগুলো নিয়ে হাজির হল। তিনি শুনে বললেন ঃ আগামীকাল উত্তর দেব। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলেন। কোরায়শরা ফিরে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর আলোকে জওয়াব দেবার জন্য ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু ওয়াদা অনুযায়ী পরদিবস পর্যন্ত ওহী আগমন করল না। বরং পনের দিন এ অবস্থায়ই কেটে গেল। ইতিমধ্যে জিবরাঈলও এলেন না এবং কোন ওহীও নাযিল হল না। অবস্থাদৃষ্টে কোরায়শরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ আরম্ভ করে দিল। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) খুবই দুঃখিত ও চিন্তিত হলেন।

পনের দিন পর জিবরাঈল সূরা কাহ্ফ নিয়ে অবতরণ করলেন। এতে ওহীর বিলম্বের কারণও বর্ণনা করে দেওয়া হল যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করার ওয়াদা করা হলে ইনশাআল্লাহ্ বলা উচিত। এ ঘটনায় এরূপ না হওয়ার কারণে হুঁশিয়ার করার জন্য বিলম্বে ওহী নাযিল করা হয়েছে। এ সম্পর্কে এ সূরায় নিম্নোক্ত আয়াত আসবে ঃ

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۝ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ —এ সূরায়

যুবকদের ঘটনাও পুরোপুরি বর্ণনা করা হয়েছে। তাদেরকে 'আসহাবে কাহ্ফ' বলা হয়। পূর্ব ও পশ্চিমে সফরকারী যুলকারনাইনের ঘটনাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে এবং রূহ্ সম্পর্কিত প্রশ্নের জওয়াবও।---(কুরতুবী, মাযহারী) কিন্তু রূহ্ সম্পর্কিত প্রশ্নের জওয়াব সংক্ষেপে দেওয়াই সমীচীন ছিল। তাই সূরা বনী ইসরাঈলের শেষে আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ কারণেরই সূরা কাহ্ফকে সূরা বনী ইসরাঈলের পরে স্থান দেওয়া হয়েছে।---(সুয়ূতী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۝١

قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ

يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۝٢ مّٰكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۝٣

وَّ يُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۝ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا
لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا
كَذِبًا ۝ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا
الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۝ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا
لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا
جُرُزًا ۝

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(১) সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি। (২) একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যাতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি ভীষণ বিপদের ভয় প্রদর্শন করে এবং মু'মিনদেরকে—যারা সৎকর্ম সম্পাদন করে—তাদেরকে এই সুসংবাদ দান করে যে, তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে। (৩) তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে। (৪) এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্য যারা বলে যে, আল্লাহ্‌ সন্তান রাখেন। (৫) এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও নেই। কত বড় তাদের মুখনিসৃত কথা। তারা যা বলে তা তো সবই মিথ্যা। (৬) যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবত আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন। (৭) আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে। (৮) এবং তার উপর যা কিছু রয়েছে, অবশ্যই তা আমি উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত করে দেব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি নিজের (বিশেষ) বান্দা [মুহাম্মদ (সা)]-এর প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং এতে (এ গ্রন্থে কোন প্রকার) সামান্যও বক্রতা রাখেননি (শাব্দিকও নয় যে, অলংকার শাস্ত্রের পরিপন্থী হবে এবং অর্থগতও নয় যে, এর কোন বিধান হিকমতের বিরুদ্ধে যাবে; বরং একে) সম্পূর্ণ সঠিক হওয়ার গুণে গুণান্বিত করেছেন। (নাযিল এ জন্য করেছেন) যাতে তা (অর্থাৎ এ গ্রন্থ কাফিরদেরকে সাধারণ-ভাবে) একটি ঘোর বিপদের—যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (তাদের উপর পরকালে) পতিত হবে—ভয় প্রদর্শন করে এবং বিশ্বাসীদেরকে—যারা সৎকর্ম সম্পাদন করে—সুসংবাদ

দান করে যে, তারা পরকালে উত্তম প্রতিদান পাবে। তাতে তারা চিরকাল থাকবে এবং যাতে (কাফিরদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে) তাদেরকে (আযাবের) ভয় প্রদর্শন করে যারা বলেঃ (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান রাখেন। (সন্তানের বিশ্বাস পোষণকারী কাফিরদেরকে সাধারণ কাফির থেকে আলাদা করে বর্ণনা করার কারণ এই যে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে আরবের সাধারণ লোক---মুশরিক, ইহুদী ও খৃস্টান সবাই লিপ্ত ছিল।) এর কোন প্রমাণ তাদের কাছে নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষের কাছেও নেই। খুব গুরুতর কথা তাদের মুখ থেকে বের হয়েছে। তারা যা বলে, তা তো সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে। (এটা যুক্তির দিক দিয়েও অসম্ভব। কোন স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও এর প্রবক্তা হতে পারে না। আপনি তাদের কুফর ও অস্বীকারের কারণে এতটুকু দুঃখিত যে) যদি তারা এই (কোরআনী) বিষয়বস্তুতে বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে সম্ভবত আপনি তাদের পশ্চাতে দুঃখ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন! (অর্থাৎ এতটুকু দুঃখ করবেন না যে, নিজেকে ধ্বংসের সম্মুখীন করে দেবেন। কারণ, এই বিশ্ব পরীক্ষা কেন্দ্র। এখানে ঈমান, কুফর এবং ভাল-মন্দের সমাবেশই থাকবে এরূপ হবে না যে, সবাই ঈমানদার হয়ে যাবে। এ পরীক্ষার জন্যেই) আমি পৃথিবীস্থ বস্তুসমূহকে তার (পৃথিবীর) জন্য শোভা করেছি, যাতে (এর মাধ্যমে) মানুষের পরীক্ষা নেই যে, কে তাদের মধ্যে ভাল কাজ করে। (অর্থাৎ এরূপ পরীক্ষা নেওয়া উদ্দেশ্য যে, কে দুনিয়ার সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে আল্লাহ্ ও পরকাল থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং কে হয় না। মোটকথা এই যে, এটা পরীক্ষা জগত। সৃষ্টিগতভাবে এখানে কেউ মু'মিন হবে এবং কেউ কাফির থাকবে। অতএব চিন্তা অনর্থক। আপনি নিজের কাজ করে যান এবং তাদের কুফরের ফল দুনিয়াতেই প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষা করবেন না। কেননা, এটা আমার কাজ। নির্দিষ্ট সময়ে হবে। সেমতে এমন একদিন আসবে যে,) আমি পৃথিবীস্থ সবকিছুকে একটি খোলা ময়দান করে দেব। (তখন এখানে কোন বসতকারী থাকবে না এবং কোন বৃক্ষ, পাহাড়, দালান-কোঠা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। মোটকথা এই যে, আপনি প্রচার কাজ অব্যাহত রাখুন। অবিশ্বাসীদের কুপরিণামের জন্য এত দুঃখিত হবেন না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

عوج—ولم يجعل له عوجا قيما শব্দের অর্থ কোন প্রকার বক্রতা এবং এক দিকে ঝুঁকে পড়া। কোরআন পাক শাব্দিক ও আর্থিক উৎকর্ষে এ থেকে পবিত্র। অলংকার শাস্ত্রের দিক দিয়েও এর কোন জায়গায় এতটুকু ত্রুটি অথবা বক্রতা থাকতে পারে না এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক দিয়েও নয়। ولم يجعل له عوجا বাক্যে যে অর্থটি

ধনাত্মক আকারে ব্যক্ত হয়েছে, তাগিদের জন্য এ অর্থকেই قَيِّمًا শব্দের মধ্যে ধনাত্মক আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কেননা, قَيِّمًا -এর অর্থ হচ্ছে مُسْتَقِيمًا (সঠিক)। مُسْتَقِيم তাকেই বলা হবে, যার মধ্যে সামান্যতম বক্রতা এবং একদিকে ঝোঁক না থাকে। এখানে قَيِّم শব্দের আরও একটি অর্থ হতে পারে; অর্থাৎ রক্ষক ও হিফাযতকারী। এ অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন পাক নিজে যেমন সম্পূর্ণ এবং সর্বপ্রকার বক্রতা, ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত, তেমনিভাবে সে অপরকেও সঠিক পথে রাখে এবং বান্দাদের যাবতীয় উপকারিতার হিফাযত করে। এখন উভয় শব্দের সারসংক্ষেপ এই যে, কোরআন পাক নিজেও সম্পূর্ণ এবং মানুষকেও স্বয়ংসম্পূর্ণকারী।---(মাযহারী)

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا ----অর্থাৎ পৃথিবীর জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ এবং ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন বস্তুর খনি---এগুলো সবই পৃথিবীর সাজসজ্জা ও চাকচিক্য। এখানে প্রশ্ন হয় যে, পৃথিবীর সৃষ্টজীবের মধ্যে সাপ, বিচ্ছু, হিংস্র জন্তু এবং অনেক ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বস্তুও রয়েছে। এগুলোকে পৃথিবীর সাজসজ্জা ও চাকচিক্য কিরূপে বলা যায়? উত্তর এই যে, দুনিয়াতে যেসব বস্তু বাহ্যত ধ্বংসাত্মক ও খারাপ, সেগুলো একদিক দিয়ে খারাপ হলেও সমষ্টিগতভাবে কোন কিছুই খারাপ নয়। কেননা, প্রত্যেক মন্দ বস্তুর মধ্যে অন্যান্য নানা দিক দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক উপকারও নিহিত রেখেছেন। বিষাক্ত জন্তু ও হিংস্র প্রাণীদের দ্বারা মানুষের চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত হাজারো অভাব পূরণ করা হয়। তাই যেসব বস্তু একদিক দিয়ে মন্দ, বিশ্বচরাচরের গোটা কারখানার দিক দিয়ে সেগুলোও মন্দ নয়। কবি চমৎকার বলেছেন ঃ

نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں
کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝
إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً

وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۝١٠ فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِي
الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۝١١ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ
اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا ۝١٢

(৯) আপনি কি ধারণা করেন যে, গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল? (১০) যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে তখন দোয়া করেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। (১১) তখন আমি কয়েক বছরের জন্য গুহায় তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই। (১২) অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরুত্থিত করি, একথা জানার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক নির্ণয় করতে পারে।

শব্দার্থঃ كَهْف-এর অর্থ বিস্তীর্ণ পার্বত্য গুহা। বিস্তীর্ণ না হলে তাকে غار বলা হয়। رقيم--এর শাব্দিক অর্থ مرقوم বা লিখিত বস্তু। এস্থলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত দৃষ্টে যাহহাক, সুদ্দী ও ইবনে যুবায়রের মতে এর অর্থ একটি লিখিত ফলক। সমসাময়িক বাদশাহ্ এই ফলকে আসহাবে কাহ্‌ফের নাম লিপিবদ্ধ করে গুহার প্রবেশ পথে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এ কারণেই আসহাবে-কাহ্‌ফকে রকীমও বলা হয়। কাতাদাহ, আতিয়্যা, আউফী ও মুজাহিদ বলেনঃ রকীম সে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত উপত্যকার নাম, যাতে আসহাবে-কাহ্‌ফের গুহা ছিল। কেউ কেউ স্বয়ং পাহাড়টিকেই রকীম বলেছেন। হযরত ইকরামা বলেনঃ আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি যে, রকীম কোন লিখিত ফলকের নাম না জনবসতির নাম, তা আমার জানা নেই। কা'ব আহ্‌বার, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রকীম রোমে অবস্থিত আয়লাহ্ অর্থাৎ, আকাবার নিকটবর্তী একটি শহরের নাম। فِتْيَة শব্দটি বহুবচন। এর একবচন فَتًى — অর্থ যুবক। فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ--এর শাব্দিক অর্থ কর্ণকুহর বন্ধ করে দেওয়া। অচেতন নিদ্রাকে এই ভাষায় ব্যক্ত করা হয়। কেননা, নিদ্রায় সর্বপ্রথম চক্ষু বন্ধ হয়, কিন্তু কান সক্রিয় থাকে। আওয়াজ শোনা যায়। অতঃপর যখন নিদ্রা পরিপূর্ণ ও প্রবল হয়ে যায়, তখন কানও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। জাগরণের সময় সর্বপ্রথম কান সক্রিয় হয়। আওয়াজের কারণে নিদ্রিত ব্যক্তি সচকিত হয়, অতঃপর জাগ্রত হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি এ ধারণা করেন যে, আসহাবে কাহ্‌ফ ও আসহাবে রকীম (এদু'টি একই দলের উপাধি) আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর নিদর্শন ছিল? [যেমন ইহুদীরা বলেছিল যে, তাদের ঘটনা আশ্চর্যজনক অথবা স্বয়ং প্রশ্নকারী কোরায়শরা একে আশ্চর্যজনক মনে করে প্রশ্ন করেছিল। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে অন্য লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এ ঘটনাটি যদিও আশ্চর্যজনক, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অন্যান্য আশ্চর্য বস্তুর মুকাবিলায় এতটুকু আশ্চার্যজনক নয়, যতটুকু তারা মনে করেছে। কেননা, যমীন, আসমান, চন্দ্র ও সমগ্র সৃষ্টজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করাটা আসল আশ্চর্যজনক ব্যাপার। কয়েকজন যুবকের দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রিত থাকা, অতঃপর জাগ্রত হওয়া তার মুকাবিলায় মোটেই আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। এই ভূমিকার পর আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনী এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ] ঐ সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন যুবকরা (তৎকালীন বে-দ্বীন বাদশাহ্‌র কবল থেকে পলায়ন করে) গুহায় (যার কাহিনী পরে বর্ণিত হবে) আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর (আল্লাহ্‌র কাছে এভাবে দোয়া করে যে,) তারা বলে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের (এ) কাজকে সঠিক করুন। (সম্ভবত রহমত বলে উদ্দেশ্য সাধন এবং সঠিক করা বলে উদ্দেশ্য সাধনে জরুরী উপকরণাদি বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দোয়া কবুল করেন এবং তাদের হিফাযত ও সকল প্রকার পেরেশানী থেকে মুক্তির উপায় এভাবে বর্ণনা করেন যে,) আমি গুহায় কয়েক বছরের জন্য তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই। অতঃপর আমি তাদেরকে (নিদ্রা থেকে) পুনরুত্থিত করি (বাহ্যিকভাবেও) একথা জানার জন্য যে, (গর্তে অবস্থানকাল সম্পর্কে মতভেদকারীদের মধ্য থেকে) কোন দল তাদের অবস্থানের সময় সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিল। (নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তাদের একদলের বক্তব্য ছিল এই যে, আমরা পূর্ণ একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ ঘুমিয়েছি। অপর দল বলল ঃ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন যে, তোমরা কতদিন ঘুমিয়েছ। আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে দ্বিতীয় দলই অধিক জ্ঞাত ছিল। তারা সময় নির্ধারণের ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র উপরই ছেড়ে দেয়। কারণ, এর কোন প্রমাণ তাদের কাছে ছিল না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আসহাবে কাহ্‌ফ ও রকীমের কাহিনী ঃ এ কাহিনীতে কয়েকটি আলোচ্য বিষয় আছে। এক, 'আসহাবে কাহ্‌ফ' ও 'আসহাবে রকীম' একই দলের দুই নাম, না তারা আলাদা দু'টি দল? যদিও কোন সহীহ্ হাদীসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই, কিন্তু ইমাম বুখারী 'সহীহ্' নামক গ্রন্থে আসহাবে কাহ্‌ফ ও আসহাবে রকীমের দু'টি আলাদা আলাদা শিরোনাম রেখেছেন। অতঃপর আসহাবে রকীম শিরোনামের অধীনে তিন ব্যক্তির গুহায় আটকে পড়া, তৎপর দোয়ার মাধ্যমে রাস্তা খুলে যাওয়ার প্রসিদ্ধ কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন, যা সব হাদীস গ্রন্থেই বিস্তারিতভাবে বিদ্যমান আছে। ইমাম

বোখারীর এ কাজ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর মতে আসহাবে কাহ্‌ফ ও আসহাবে রকীম পৃথক পৃথক দু'টি দল এবং আসহাবে রকীম ঐ তিন ব্যক্তিকে বলা হয়েছে, যারা কোন সময় পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেছিল। এরপর পাহাড়ের একটি বিরাট পাথর গুহার মুখে পড়ে যাওয়ায় গুহা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের বের হওয়ার পথ থাকে না। আটক ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সৎকাজের ওসীলা দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে যে, যদি আমরা এ কাজটি খাঁটিভাবে আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তবে নিজ কৃপায় আমাদের পথ খুলে দিন। প্রথম ব্যক্তির দোয়ায় পাথর কিছুটা সরে যায়। ফলে ভিতরে আলো আসতে থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তির দোয়ায় আরও একটু সরে যায় এবং তৃতীয় ব্যক্তির দোয়ায় রাস্তা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু হাফেয ইবনে হাজার (রহ) বুখারীর টীকায় বলেছেন যে, উপরোক্ত তিন ব্যক্তির নাম আসহাবে রকীম, হাদীসদৃষ্টে এর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। ব্যাপার এতটুকু যে, গুহার ঘটনার বর্ণনাকারী নো'মান ইবনে বশীরের রেওয়ায়েতে কোন কোন রাবী এই কথাগুলো সংযুক্ত করেছেনঃ নো'মান ইবনে বশীর বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। এই অতিরিক্ত কথাগুলো ফতহুল বারীতে বাযযার ও তাবারানীর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু প্রথমত সিহাহ্ সিত্তা ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এই হাদীসের সাধারণ রাবীদের যেসব রেওয়ায়েত বিদ্যমান আছে, সেগুলোতে কেউ নো'মান ইবনে বশীরের উপরোক্ত বাক্য উদ্ধৃত করেননি। স্বয়ং বুখারীর রেওয়ায়েতও এই বাক্য থেকে মুক্ত। দ্বিতীয়ত এই বাক্যেও এ কথার উল্লেখ নেই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তিকে আসহাবে রকীম বলেছিলেন। বরং বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) রকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। এবং এ প্রসঙ্গে তিন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন। রকীমের অর্থ সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদদের মধ্যে যে মতবিরোধ উপরে বর্ণিত হয়েছে এটাই তার প্রমাণ যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে রকীমের অর্থ নির্ধারণ সম্পর্কে কোন হাদীস ছিল না। নতুবা রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন অর্থ নির্দিষ্ট করে দিলে সাহাবী, তাবেয়ী ও অন্যান্য তফসীরবিদ এর বিপরীতে অন্য কোন অর্থ নেবেন---এটা কিরূপে সম্ভবপর ছিল? এ কারণেই বুখারীর টীকাকার হাফেয ইবনে হাজার আসহাবে কাহ্‌ফ ও আসহাবে রকীমের দু'টি আলাদা আলাদা দল হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে একই দলের দুই নাম হওয়াই ঠিক। রকীমের আলোচনার সাথে সাথে গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তির আলোচনা এসে গেছে। এ থেকে জরুরী হয় না যে, এই তিন ব্যক্তিই আসহাবে রকীম ছিল।

এস্থলে হাফেয ইবনে হাজার একথাও প্রকাশ করেছেন যে, আসহাবে কাহ্‌ফ সম্পর্কে কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনা স্বয়ং ব্যক্ত করছে যে, আসহাবে কাহ্‌ফ ও আসহাবে রকীম একই দল। এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, তাঁরা একই দল।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে স্বয়ং এ কাহিনীর বিবরণ। এর দু'টি অংশ আছে। এক, এ কাহিনীর প্রাণ ও আসল উদ্দেশ্য, যদ্দ্বারা ইহুদীদের প্রশ্নের জওয়াব হয়ে যায়

এবং মুসলমানদের জন্য হিদায়েত ও উপদেশ। দ্বিতীয় অংশের সম্পর্ক শুধু এ কাহিনীর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভূমিকার সাথে। আসল উদ্দেশ্য বর্ণনায় এর বিশেষ কোন প্রভাব নেই। উদাহরণত ঘটনাটি কোন কালে এবং কোন শহরে ও জনপদে সংঘটিত হয় যে, কাফির বাদশাহ্র কাছ থেকে পলায়ন করে তাঁরা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে কে ছিল? তার ধর্ম বিশ্বাস ও চিন্তাধারা কি ছিল? সে তাঁদের সাথে কি ব্যবহার করেছিল, যদ্দারুন তাঁরা পলায়ন করতে ও গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন? তাঁদের সংখ্যা কত ছিল? তাঁরা কতকাল ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন? তাঁরা এখনও জীবিত আছেন, না মরে গেছেন?

কোরআন পাক স্বীয় বিজ্ঞজনোচিত মূলনীতি ও বিশেষ বর্ণনা পদ্ধতি অনুযায়ী সমগ্র কোরআনে একটি মাত্র কাহিনী তথা ইউসুফ-কাহিনী ব্যতীত কোন কাহিনী সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থাদির অনুরূপ পূর্ণ বিবরণ ও ক্রমসহকারে বর্ণনা করেনি; বরং প্রত্যেক কাহিনীর শুধু ঐ অংশ স্থানে স্থানে বর্ণনা করেছে, যা মানবীয় হিদায়েত ও শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত। (ইউসুফ-কাহিনীকে এ পদ্ধতির বাইরে রাখার কারণ সূরা ইউসুফের তফসীরে বর্ণিত হয়েছে।)

আসহাবে কাহ্ফের কাহিনীতেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কোরআন বর্ণিত অংশগুলোর এর আসল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অবশিষ্ট যেসব অংশ নিরেট ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক, সেগুলো উল্লেখ করা হয়নি। আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা ও ঘুমের সময়কাল সম্পর্কিত প্রশ্নও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং জওয়াবের প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে এ নির্দেশও প্রদত্ত হয়েছে যে, এ জাতীয় প্রসঙ্গে বেশি চিন্তা-ভাবনা ও তর্ক-বিতর্ক করা সমীচীন নয়। এগুলো আল্লাহ্র উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

কোরআনের শিক্ষা বর্ণনা করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অভীষ্ট কর্তব্য ছিল। উপরোক্ত কারণে তিনিও কাহিনীর এসব অংশ বর্ণনা করেননি। প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ীগণ কোরআনী বর্ণনা-পদ্ধতি অনুযায়ীই এ ধরনের ব্যাপারে নিম্নোক্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন: ابهموا ما ابهم الله অর্থাৎ, যেসব বিষয়কে আল্লাহ্ তা'আলা অস্পষ্ট রেখেছেন, সেগুলোকে তোমরাও অস্পষ্ট থাকতে দাও। (কারণ এতে আলোচনা ও গবেষণা উপকারী নয়।)---(ইতকান, সুয়ূতী)

প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ীগণের এই কর্মপন্থার তাগিদ অনুযায়ী এই তফসীরেও কাহিনীর ঐসব অংশ বাদ দেওয়া উচিত ছিল, যেগুলো কোরআন ও হাদীস বাদ দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কারকেই সর্ববৃহৎ কৃতিত্ব মনে করা হয়। পরবর্তী যুগের তফসীরবিদগণ এ জন্যই তাঁদের গ্রন্থে কম-বেশি এসব অংশও বর্ণনা করেছেন। তাই আলোচ্য তফসীরে কাহিনীর যেসব অংশ স্বয়ং কোরআনে উল্লিখিত আছে, সেগুলো তো আয়াতের তফসীরের অধীনে বর্ণিত হবেই, এছাড়া অবশিষ্ট ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অংশও প্রয়োজন অনুসারে বর্ণনা করা হচ্ছে। বর্ণনা করার